দাম : ষোলো টাকা

স্বস্তিকা

রবীন্দ্রনাথের সকল প্রয়াসের মধ্যেই রাষ্ট্রবোধ থরেবিথরে সাজানো আছে — পৃঃ ২৩

ইউরোপীয় ন্যাশানালিজমের অসারতা বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ — পৃঃ ১৩

৭৫ বর্ষ, ৩৬ সংখ্যা।। ৮ মে, ২০২৩।। ২৪ বৈশাখ - ১৪৩০।। যুগাব্দ - ৫১২৫।। website : www.eswastika.com

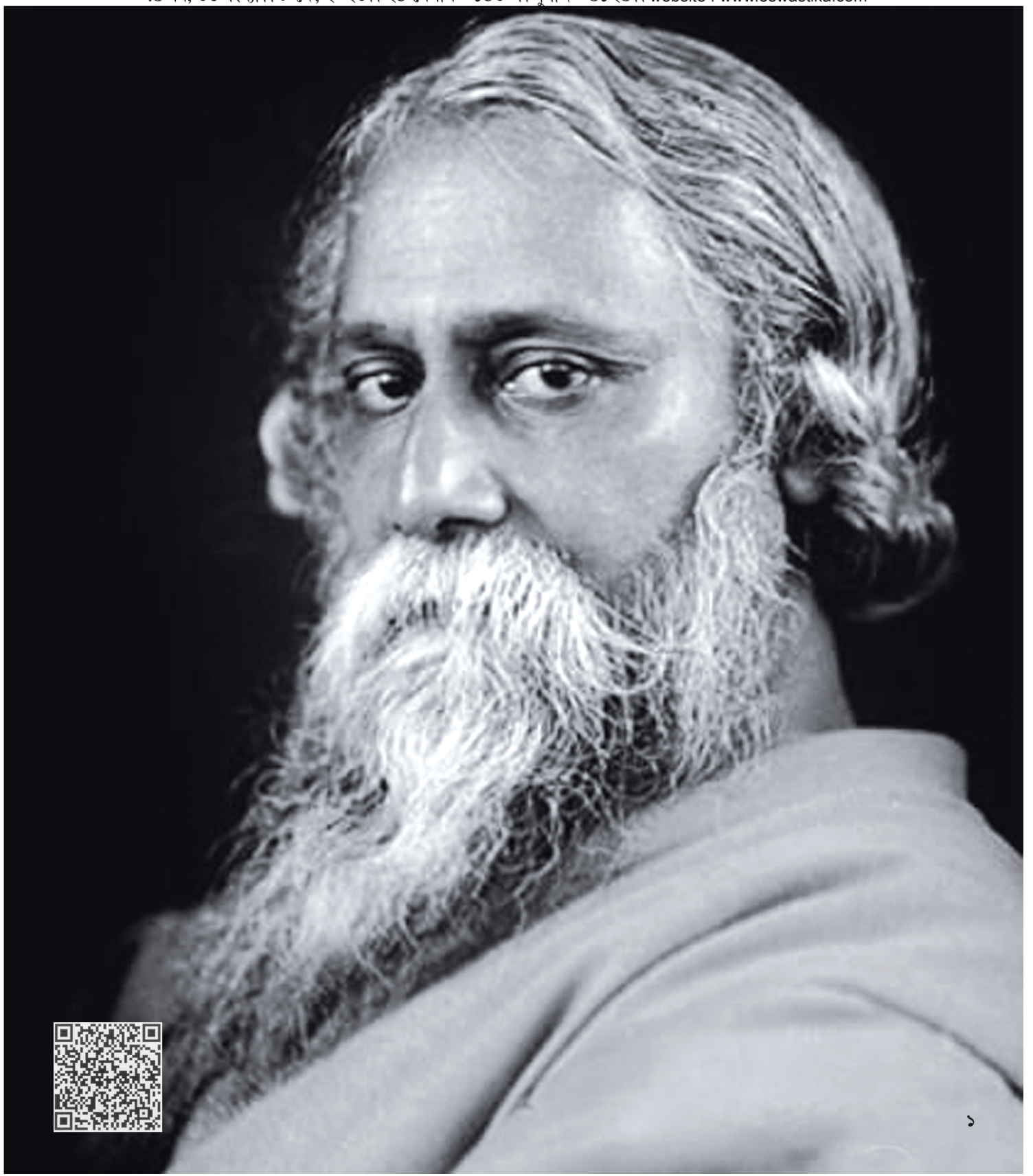

CENTURYPLY®
CENTURYPLY®
CENTURYLAMINATES®
CENTURYVENEERS®
CENTURYPRELAM®
CENTURYMDF®
CENTURYDOORS™
zykron
FIBRE CEMENT BOARDS & PLANKS
STARKE
NEW AGE PANELS
SAINIK
PLYWOOD
HAMESHA TAIYYAR
For any queries, SMS 'PLY' to 54646 or call us on 1800-2000-440 or give a missed call on 080-1000-5555
E-mail: kolkata@centuryply.com | CenturyPlyOfficial | CenturyPlyIndia | YouTube Centuryply1986 | Visit us: www.centuryply.com

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৫ বর্ষ ৩৬ সংখ্যা, ২৪ বৈশাখ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

৮ মে - ২০২৩, যুগাব্দ - ৫১২৫,

Website : www.eswastika.com

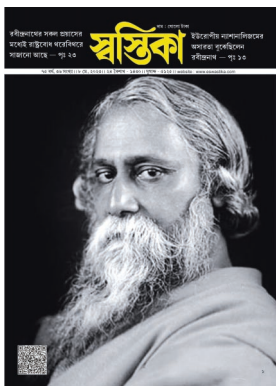

সম্পাদক : তিলক রঞ্জন বেরা

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৩৩০৩৭৭৯২৩

দাম : ১৬ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৭০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2022-2024

R N I No. 5257/1957

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com
Website : www.eswastika.com

শুভস্বস্তিকা প্রিন্টস ফাউন্ডেশন -এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ☐ ৫

'সর্বম অত্যন্তম্ গর্হিতম্' 'তাই হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বে না ☐ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় ☐ ৬

তিহাড়ে অক্সিজেন কম পড়বে না তো! ☐ সুন্দর মৌলিক ☐ ৭

ভগবানের নাম স্মরণ করে ভারতের নির্বাচন হয় না ☐ হিলাল আহমেদ ☐ ৮

মোদীর 'মন কী বাতে'র সাফল্য দুনিয়াজোড়া ☐ বিশ্বামিত্র ☐ ১০

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মতান্তর হলেও মনান্তর কোনোদিন হয়নি ☐ অধ্যাপক ড. সমর সরকার ☐ ১১

ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের অসারতা বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ☐ পিন্টু সান্যাল ☐ ১৩

রবীন্দ্র-রামেন্দ্র জুটি সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির জাগরণের কাজটি করেছিলেন ☐ দীপক খাঁ ☐ ১৭

রবীন্দ্রনাথের সকল প্রয়াসের মধ্যেই রাষ্ট্রবোধ থরেবিথরে সাজানো আছে ☐ কল্যাণ গৌতম ☐ ২৩

রবীন্দ্রনাথ মননে বাঙ্গালি চেতনায় ভারতীয় ☐ ড. রাজলক্ষ্মী বসু ☐ ২৬

সদাচারই পৌঁছে দেয় ধর্মের সিংহদুয়ারে ☐ নন্দলাল ভট্টাচার্য ☐ ৩১

মানুষের দৃঢ় মেলবন্ধন ত্রিপুরার গড়িয়া পুজো ☐ সেন্টুরঞ্জন চক্রবর্তী ☐ ৩৪

রাজনীতির কদর্য রূপ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন ঘরে বাইরে উপন্যাসে ☐ ড. জয়ন্ত কুশারী ☐ ৩৫

মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উন্নতির পরিপন্থী ☐ দিগন্ত চক্রবর্তী ☐ ৩৭

পাকিস্তান আপাতত গাধা রপ্তানি করে বাঁচতে চায় ☐ মণীন্দ্রনাথ সাহা ☐ ৪৩

কালে কালে আরো কত কি দেখিব! ☐ শিতাংশু গুহ ☐ ৪৪

স্বামীজীর আমেরিকা মাত্রা ও শিকাগো বক্তৃতার পটভূমি ☐ সূর্য শেখর হালদার ☐ ৪৫

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ☐ অঙ্গনা : ২১ ☐ সুস্বাস্থ্য : ২২ ☐ সমাবেশ সমাচার : ২৯-৩০ ☐ খেলা : ৩৮ ☐ অন্যরকম : ৩৯ ☐ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ ☐ সংবাদ প্রতিবেদন : ৪৯ ☐ চিত্রকথা : ৫০

প্রকাশিত হবে
১৫ মে ২০২৩

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
১৫ মে ২০২৩

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

১০০তম পর্বে 'মন কী বাত'

বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর যথার্থই বলেছেন, দেশকে নিঃশব্দে বদলে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর রেডিয়ো অনুষ্ঠান 'মন কী বাত'। ভারতের কোনো প্রধানমন্ত্রী দেশের সাধারণ নাগরিকের সঙ্গে কথা বলছেন, তাদের নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন— একথা আগে কল্পনাও করা যেত না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সাধারণ মানুষের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকত অভিজাততন্ত্রের দেওয়াল। সেই দেওয়ালটাই ভেঙে দিয়েছেন নরেন্দ্র মোদী। স্বস্তিকার আগামী সংখ্যায় থাকবে 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানের সাফল্য নিয়ে আলোচনা। লিখবেন ড. রাজলক্ষ্মী বসু ও বিমলশঙ্কর নন্দ প্রমুখ।

দাম ষোলো টাকা মাত্র

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

স্বস্তিকার প্রচ্ছদে **QR code** ছাপানো হচ্ছে। এখানেও সরাসরি টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name :
SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION
A/C. No. : **103502000100693**
IFSC Code : **IOBA0001035**
Bank Name :
INDIAN OVERSEAS BANK
Branch : **Sreemani Market**
Kolkata-700 006

একটি বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

হিন্দু জাতীয়তাবোধের কণ্ঠস্বর সাপ্তাহিক স্বস্তিকা পত্রিকা অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ২০২২ সালে পঁচাত্তর বর্ষে পদার্পণ করেছে। এই শুভ অবসরে আমরা স্বস্তিকার পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে একটি বিশেষ আবেদন রাখছি। সাপ্তাহিক স্বস্তিকার আজীবন এবং দশ বছরের সদস্য হিসেবে নাম নথিভুক্ত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। আজীবন সদস্যতার জন্য ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা এবং দশ বছরের সদস্যতার জন্য ১০,০০০ (দশ হাজার) টাকা ধার্য করা হয়েছে। সদস্যদের কাছে প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহে চারটি/পাঁচটি সংখ্যা (বিশেষ সংখ্যা-সহ) এক সঙ্গে রেজিস্ট্রি ডাকযোগে পাঠানো হবে। এটি এক ধরনের অনুদান মাত্র। সকল পাঠক ও শুভানুধ্যায়ীর নিকট বিনীত নিবেদন, তাঁরা যেন এই বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং আমাদের পূর্ণ সহযোগিতা করেন।

সদস্যতার জন্য টাকা পাঠাবার নিয়ম ঃ—

স্বস্তিকা দপ্তরে টাকা জমা দিতে পারেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই চেকSubhswastika Prints Foundation -এই নামে দিতে হবে। এছাড়া সরাসরি অনলাইনে টাকা পাঠাতে পারেন। টাকা পাঠানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনার পূর্ণ ঠিকানা পিন কোড সহ, ফোন নম্বর দিয়ে স্বস্তিকার সম্পাদকের নামে একটি চিঠি দিয়ে জানান। যাতে আপনার দেওয়া টাকার রশিদ ও স্বস্তিকা নিয়মিত আপনার ঠিকানায় পাঠানো সম্ভব হয়।

অনলাইনে টাকা পাঠানোর ঠিকানা—

Account Name : **SUBHSWASTIKA PRINTS FOUNDATION**
Bank A/c --- 103502000100693
IFSC -- IOBA0001035
Bank -- Indian Overseas Bank
Branch : Sreemani Market, Kolkata-700006.

সম্পাদকীয়

রাষ্ট্রবাদী রবীন্দ্রনাথ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজেই বলিয়াছেন, সাহিত্য কথাটি 'সহিত' শব্দের সঙ্গে যুক্ত রহিয়াছে। তিনি মনে করিতেন সাহিত্য সমাজ তৈরির শর্ত। তিনি প্রাজ্ঞ ঋষির ন্যায় অনুভব করিয়াছিলেন ভারতবর্ষীয় সমাজ জীবন্ত। তাই তাঁহার সমস্ত সাহিত্যকর্মে মানুষের সহিত মানুষের সম্পর্ক এবং মানুষের সহিত দেশের সম্পর্ক প্রতিফলিত হইয়াছে। মানুষের সহিত মানুষের যে সম্পর্ক তাহাকে তিনি সজীব বন্ধন বলিয়াছেন। তাঁহার মন প্রাণ জুড়িয়া রহিয়াছে দেশ এবং দেশের মানুষ। দেশের মানুষের উন্নয়নের জন্য তিনি শাসকের উপর নির্ভরশীল থাকিবার পক্ষপাতী ছিলেন না। সমাজই সক্রিয় হইয়া মানুষের কল্যাণার্থে নিয়োজিত হইবে। তিনি তাঁহার স্বদেশী সমাজ প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, সমাজ শক্তিশালী হইলেই মানুষের দুঃখ-কষ্ট ঘুচিবে। তিনি প্রাধান্য দিয়াছেন সমাজকে। তাঁহার ভাবনায় বিরাজ করিত গ্রামবাঙ্গলার পুনর্গঠন। বোলপুরে পল্লীপুনর্গঠন কেন্দ্র স্থাপন করিয়া তিনি ইহার নজির রাখিয়াছেন। এখন তাহার নাম হইয়াছে শ্রীনিকেতন।

তিনি স্বদেশপ্রেমের কবি। তিনি মনে করিতেন এই দেশ মৃন্ময়ী নহে, চিন্ময়ী। দেশের মানুষ ভালো হইলেই দেশ ভালো হইবে। দেশনেতাদের প্রতি তাঁহার সতর্কবাণী ছিল, দেশকে ভালো না বাসিলে, ভালো করিতে চাহিলেও ভালো করা যায় না। দেশের বিভাজনের কষ্ট তাঁহাকে ভোগ করিতে হয় নাই, কিন্তু বঙ্গভঙ্গের কষ্ট তিনি মর্মে মর্মে অনুভব করিয়াছিলেন। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদীরূপে তিনি ছিলেন সর্বাগ্রে। রাখিবন্ধন হইতে শুরু করিয়া বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে দেশের মানুষকে জাগ্রত করিবার মানসে নানান কর্মসূচি গ্রহণ করিয়াছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এবং জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকণ্ডের প্রতিবাদে তাঁহার স্বদেশ প্রেমের স্ফুলিঙ্গ দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে গতি প্রদানের জন্য তিনি সাতাশটি দেশাত্মবোধক গান রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গদেশের নবজাগরণের অগ্রদূতেদের ভূয়সী প্রশংসা করিয়ছিলেন তিনি। তিনি বিশ্বাস করিতেন দেশের পুনরুত্থান ঘটিবে অতীতের বৈদিক আরণ্যক সভ্যতার গৌরব মহিমায়।

কেহ কেহ বলিয়া থাকেন, রবীন্দ্রনাথ জাতীয়তাবাদী ছিলেন না, ছিলেন আন্তর্জাতিকতাবাদী। হ্যাঁ, ইহা সত্য, তিনি জাতীয়তাবাদকে পাশ্চাত্যের ন্যাশনালিজমের অনুকরণ বলিয়া মনে করিতেন। পশ্চিমের জাতীয়তাবাদকে আধিপত্যবাদ বলিয়া তীব্র কটাক্ষ করিয়াছেন। উহা মানবতা ও মানব সভ্যতার পক্ষে ভয়াবহ। দেশনেতার উদ্দেশে বলিয়াছেন, দেশকে আপন করিয়া না লইলে বিদেশকেও ভালোবাসা যায় না। তাই তিনি পশ্চিমের আমদানি করা জাতীয়তাবাদী নন, তিনি রাষ্ট্রবাদী। অন্তঃকরণে জন্মভূমির প্রতি মাতা-পুত্রের সম্পর্কই হইল রাষ্ট্রবোধ। রাষ্ট্র শব্দটি রাজনৈতিক নহে, তাহা একান্ত সংস্কৃতিবাচক। তিনি রাষ্ট্রগান রচনা করিয়াছেন। ধর্মীয় কট্টরপন্থীরা বহুবার রাষ্ট্রগানকে বদল করিবার দাবি জানাইয়াছে। তিনি তাহাতে কোনোরূপ আমল দেন নাই। তিনি ভারতের রাষ্ট্রীয় কবি। স্বাধীনতা আন্দোলনে বিপ্লবীরা তাঁহার কবিতা আবৃত্তি করিয়া, তাঁহার গান গহিয়া নিজেদের বিপ্লবী চেতনাকে জাগ্রত রাখিতেন। তিনি ভারতাত্মার জয়গান গাহিয়াই তো বিশ্বকবি হইয়াছেন। দেশের মানুষকে প্রাণ দিয়া ভালোবাসিতেন বলিয়াই তো মানবতাবাদী হইয়াছেন। তাই তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনের প্রত্যাশী ছিলেন। অভারতীয় মানসিকতার লোকেরা তাঁহাকে বুর্জোয়া বলিয়া গালি দিয়াছেন, তাঁহার মূর্তি ভগ্ন করিয়াছেন, তথাপি তিনি শুধু ভারতবাসী নহে বিশ্ববাসীর মন-প্রাণ জুড়িয়া রহিয়াছেন।

সুভাষিতম্

বেশো ভাষা সদাচারঃ রক্ষণীয়ং ইদং ত্রয়ম্।
অন্ধানুকরণমন্যেষাম্ অকীর্তিকরমুচ্যতে।।

নিজের বেশ, ভাষা ও সদাচার– এই তিনটিকে সযত্নে রক্ষা করতে হয়। কেননা অন্ধ অনুকরণ করলে শুধুমাত্র অপযশই প্রাপ্ত হয়।

‘সর্বম্ অত্যন্তম গর্হিতম্’

‘তাই হাকিম নড়লেও হুকুম নড়বে না’

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

দুরাত্মার ছলের অভাব হয় না। কয়েক ঘণ্টা ধরে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিচারক অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে সব দুর্নীতি মামলা থেকে সুপ্রিম কোর্ট সরিয়ে দিয়েছেন। পরে জানা যায় খবর ভুয়ো। বহু মামলার ভিতর কেবল একটি মামলা সরানো হয়েছে। তাঁর কোনো রায় বা আদেশ খারিজ করা হয়নি। খবর কারবারিরা অস্বস্তিতে থাকা শাসক দলের হয়ে প্রচার চালিয়েছিল। তৃণমূলের অবোধ নির্বোধরা তাতে উদ্বাহু নৃত্য করছিল। শাসক তৃণমূলের দুর্নীতি রুখতে অভিজিৎবাবুকে ত্রাণকর্তা ঠাউরেছিলেন এ রাজ্যের মানুষ আর বিরোধী রাজনৈতিক শিবির। সেটাই বড়ো ভুল। রাজ্যের মানুষ জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে কোনো অন্যায় শাসক বিরোধী হলে তার শাস্তি নেই। তাই আদালতেই ভরসা। এর ফলে জনমনে একটা ধারণা সৃষ্টি হয়, কেবল অভিজিৎ- এই রয়েছে সব সমাধান।

এর কারণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তাঁর কয়েকটি দৃষ্টান্তকারী রায়। এটাই তাঁর কাজ যা তিনি চূড়ান্ত যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেছেন। কোনো ব্যক্তি সৎ আর ন্যায়-নিষ্ঠ হতে পারেন। আর হওয়াটাই উচিত। তবে তার জন্য তাঁকে বাহবা দিতে হবে? এটা ভুল। ফলে আদালতকে অভিজিৎবাবুর সঙ্গে সমার্থক করে দেখার খেসারত অভিজিৎবাবুকে নিজেকেই দিতে হলো। আবেগপ্রবণ অভিজিৎবাবু এই সিদ্ধান্তকে মৃত্যুদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সেটা করে পক্ষান্তরে আবার বুঝিয়ে ফেলেছেন দুর্নীতির কারবারিদের মধ্যে কেউ রয়েছেন যার অন্যায় ফাঁস করতে তিনি ভীষণ আগ্রহী। কেন? এইখানেই বিচারক হিসেবে তাঁর নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। তিনি যত ন্যায়নিষ্ঠ বা ন্যায়পরায়ণ হন না কেন। কথিত আছে ‘বোকারা মনের ভাব প্রকাশ করে’। রাতারাতি দুর্নীতি বিরোধী ‘ত্রাতা’ হয়ে উঠতে গিয়ে অভিজিৎবাবু কৃত্রিম যশ প্রতিষ্ঠার ফাঁদে পা দিয়েছেন। বৈষ্ণব শাস্ত্র বলে ‘যশ প্রতিষ্ঠা শূকরি বিষ্ঠা’। আমি সহমত।

অভিজিৎবাবু সেই তৃতীয় রিপুলোভে ফেঁসে গিয়েছিলেন। একটি গণমাধ্যমকে সাক্ষাৎকার দিয়ে ফেলেন। সময়ের বিচারে তা অযাচিত আর অপ্রয়োজনীয় ছিল। ভারতীয় বিচার ব্যবস্থায় এই ধরনের নিদর্শনের উদাহরণ বড়ো একটা নেই। তাই তিনি উদাহরণ স্থাপন করতে চান। অনেকের দাবি তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। তবে তার জন্য তিনি নিজে দায়ী। তাঁর যশ ইচ্ছাকে সম্মান জানিয়েও বলতে বাধ্য হচ্ছি ‘লোভে পাপ আর পাপে মৃত্যু’। চূড়ান্ত রায় পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত ছিল। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলতেন, ‘যে সয় সে রয়’। তার অর্থ সহ্য ক্ষমতা। আর অভিজিৎবাবুর ক্ষেত্রে অধৈর্য্যভাব। অভিজিৎবাবু আদালতের অংশ নিজে আদালত নন।

মমতা যেমন দুর্নীতির সঙ্গে সমার্থক হয়ে গিয়েছেন অভিজিৎবাবু আদালতের সঙ্গে তা নন। মমতা দুর্নীতির ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন তৈরি করেছেন যা তাঁকে খতম করবে। এটা ভাবা কেবল ভুল নয় আবার অন্যায়ও বটে যে কলকাতার উচ্চ আদালতে অভিজিৎবাবুর সমকক্ষীয় আর ন্যায়নিষ্ঠ বিচারক বিরল। মনে রাখা প্রয়োজন ‘হাকিম পালটালেও হুকুম পালটায় না’। তাই সুপ্রিম ধাক্কায় অভিজিৎবাবু আপাতত কাত হয়ে পড়লেও দুর্নীতি আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে আদালত চুপ থাকবে না। কোনো তদন্ত বন্ধ হবে না। অভিজিৎবাবুর ঘটনার পরে আদালত যে আরও অনেক বেশি দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে তা নিশ্চিত। যে কোনো নিরপেক্ষ বিচারককে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই নির্মোহ ভাবেই করতে হয়। লড়াইয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে বিচার নঞর্থক হয়ে যেতে পারে। অনর্থক অতি উৎসাহের বাঁধনে পড়ে বিচারককে তার কুফল ভুগতে হয়।

যে কোনো নিরপেক্ষ বিচারককে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই নির্মোহ ভাবেই করতে হয়। লড়াইয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত হলে তা বিচার নঞর্থক হয়ে যেতে পারে। অনর্থক অতি উৎসাহের বাঁধনে পড়ে বিচারককে তার কুফল ভুগতে হয়।

কেবল অভিজিৎবাবুকে সামনে রেখে দুর্নীতি বিরোধী পদক্ষেপ ভুল ছিল। বিরোধীদের মতো অভিজিৎবাবুও হয়তো বুঝতে চাননি যে তাঁকে ত্রাণকর্তা সাজানোটা মহাভুল। তাই সুপ্রিম কোর্ট কান মুলে বুঝিয়ে দিয়েছেন যে মমতার দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইটা কোনো সরকার বা ব্যক্তির নয়। তা আদালতের নিয়ন্ত্রণাধীন। দুর্নীতিবিরোধী লড়াইয়ের বহু নজির এ দেশের আদালতের রয়েছে। অভিজিৎবাবু নিজের লড়াইয়ে মশগুল থেকে তা ভুলে গিয়েছিলেন। সুপ্রিম ধাক্কা খাওয়ার পর চোর চিনতে তিনি আর ভুল করবেন না। ‘ধর তক্তা মার পেরেক’ করে সিদ্ধান্ত নেবেন না। আদালতের লড়াই আর রাস্তার লড়াইয়ে বিস্তর ফারাক। তাই বলা হয় ‘জাস্টিস হ্যারিড ইজ অলসো জাস্টিস ব্যেরিড’ যেমন ‘জাস্টিস ডিলেড ইজ জাস্টিস ডিনায়েড’। □

তিহাড়ে অক্সিজেন কম পড়বে না তো!

বীর ভাইয়ের দিদি,

পঞ্চায়েত ভোট এসে গেল দিদি। তবে ভাইপো দাদা যে ভাবে ঘুরতে বেরিয়েছেন তাতে সেই কর্মসূচি শেষ না হলে মনে হয় আপনার নির্বাচন কমিশন ভোটের দিনক্ষণ বলবে না। তবে ভাইপো দাদার গলা শুনে যা মনে হলো, দম ফুরিয়ে এসেছে। ৬০ দিন টানা কষ্টের হয়ে যাবে। তারপরে যত বেয়াদবের দল দাদার সফরের মধ্যেই ব্যালট পেপার নিয়ে টানাটানি করছে। আমার মনে আরও একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে। এই যে ভাইপো দাদা ভোট নিচ্ছেন, দিচ্ছেন ক'জন? মানে ভোটদানের হার কত? উনি তো বলছেন জনগণের প্রার্থী করবেন। কিন্তু সরকারি খরচে, পুলিশ দিয়ে যাঁদের ভোটদান কেন্দ্রে আনা হচ্ছে তাঁরা কারা? গ্রামের মানুষ না কি তৃণমূল কর্মী? যদি প্রথমটা হয় তবে কিন্তু মুশকিল। কারণ, তাঁরা এমন কারও নাম লিখে দিতে পারে যিনি কয়লা, গোরু, চাকরি কিছুই বিক্রি করতে জানেন না। আবার যদি তৃণমূলের লোকেরাই তৃণমূলকে ভোট দেন তবে ভালো প্রার্থী বাছা মানে সেটা কম্বলের লোম বাছার কাণ্ড হয়ে যাবে।

যাক, যে প্রসঙ্গে চিঠি লেখা শুরু করেছিলাম সেটা আগে বলি। দিদিভাই, কেষ্ট বিনা পঞ্চায়েত নির্বাচন হবে কী করে? আপনি বলবেন, উনি ভোটের আগে যা যা বলতেন, যা যা করতেন সেগুলি গোটা রাজ্যের সব তৃণমূল কর্মীদের উৎসাহিত করার জন্য। ওঁর চড়াম চড়াম শব্দ সবাই শুনতে পেত। বাংলার সব প্রান্তেই গুড়-বাতাসা, নকুলদানা সাপ্লাই হতো। তার কী হবে।

আপনি মনে মনে ভেবেছিলেন, জেল আর কতদিনের হবে। বীরের সম্মান দিয়ে বরণ করে নেবেন পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে। তাই তো, এখনও পর্যন্ত জেলা সভাপতি বানিয়ে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তিহাড় জেল তৃণমূল জেলা কমিটির সভাপতি বানিয়ে দিলে হয় না। কন্যাও এখন সেখানে। ফলে তাঁকে দেখভালের সমস্যা হবে না। আরও কারা কারা সব রয়েছেন। ওঁর হিসাব রক্ষকও একই জেলে। ফলে চিন্তা তো নেই। জাতীয় দলের তকমা হারানো তৃণমূল সর্বভারতীয় হওয়ার চেষ্টা তো তিহাড় জেল থেকেই শুরু করতে পারে। না, দিদি খোঁচা মনে করবেন না। এটা একজন অনুগত ভাইয়ের পরামর্শ মাত্র। এটা বলছি এই কথাটা ভেবে যে, হাজার কোটি টাকার গোরু পাচার মামলায় বছর তিনেক তো ওখানেই কাটাতে হবে। তখন লোকসভা নির্বাচনে কিংবা পরের বিধানসভা ভোটও হয়ে যেতে পারে।

দিদি, আমি বলছি বলে আবার যেন

দিদি, আপনি বরং দিল্লির কাছে দাবি করুন, হিসাব না দিতে পারা পাওনা টাকা দিতে হবে না। তিহাড় জেলে যেন অক্সিজেনের সাপ্লাই কম না হয়। বরং, বাড়তি অক্সিজেনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক।

সত্যি সত্যিই বীরভূমের জেলা সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেবেন না কেষ্ট দাদাকে। তৃণমূলে ভাইপো এক নেতা, এক পদ নীতি ফলাতে চেয়েছিল। কিন্তু এটা তো বিজেপি নয় যে, সব নীতি মেনে চলতে হবে। এখানে মন্ত্রীই মেয়র হন। সাংসদ কাউন্সিলার। তাছাড়া, আসলে তো দিদি আপনিই সব। আপনার মন্ত্রীরা তো শুধুই নামকাওয়াস্তে। দু'জন গায়ক মন্ত্রী আছেন আপনার। তাঁদের দেখে মনে হয় আপনার সভাসদ। সেই রাজাদের থাকত না। সেই রকম আর কী। আপনি কোথাও গেলে আপনার মনোরঞ্জনের জন্য তাঁরা গান গেয়ে শোনান। কোনওদিন নিজেদের দপ্তর নিয়ে একটি কথাও মুখে আনতে দেখিনি। আমি আজ খালি কথার খেই হারিয়ে ফেলছি। আসলে দিকে দিকে আপনার ভাইয়েরা যে ভাবে নিজেদের মধ্যেই মারামারি করছেন তা দেখে আমার মন ভালো নেই। আসলে, আপনার মনের সঙ্গে আমার মন এক সুতোয় বাঁধা। এক সঙ্গে খারাপ হয়, এক সঙ্গে ভালো হয়।

একটা কথা বলতে বারবার ভুলে যাচ্ছি। এবার বলে চিঠি শেষ করে দেব। বলছি, কেষ্টদাদাকে একদম পদ থেকে সরাবেন না। উনি যদি রেগেমেগে ভাইপো দাদার নাম বলে দেয় তবে না আপনার মতো আমিও কষ্টে ভেঙে পড়ব। মাথায় অক্সিজেন ঢুকবে না। তাই, আপনি বরং দিল্লির কাছে দাবি করুন, হিসাব না দিতে পারা পাওনা টাকা দিতে হবে না। তিহাড় জেলে যেন অক্সিজেনের সাপ্লাই কম না হয়। বরং, বাড়তি অক্সিজেনের জন্য ব্যবস্থা নেওয়া হোক। □

অতিথি কলম

হিলাল আহমেদ

ভগবানের নাম স্মরণ করে ভারতের নির্বাচন হয় না

আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতা ও রাজনৈতিক দল ধর্মের প্রতি সম্মান আর ধর্মকে নির্দিষ্ট উদ্দেশে ব্যবহার করার তফাতটা বুঝতে চাইছেন না।

আসন্ন কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনে সেখানকার বড়োসড়ো লিঙ্গায়েত সম্প্রদায়ের ভোট নিজেদের দিকে রাখার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির তীব্র টানাপোড়েন ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য দিকের কথা বলে— নির্বাচনে নির্দিষ্ট ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মীয় প্রভাবের গুরুত্ব। রাজনৈতিক দলগুলি ও সমাজে প্রতিষ্ঠিত সংবাদ মাধ্যম আমাদের সর্বদা বিশ্বাস করাতে চায় যে ভারতীয় ভোটাররা বিশেষ করে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সর্বদা তাদের ধর্মীয় শিক্ষাগুরু বা ধর্মের প্রচার বৃদ্ধির জন্য প্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দেশ অনুযায়ীই নিজেদের ভোট ব্যবহার করে।

ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ভোট নির্ধারিত হওয়ার তত্ত্বটা সাধারণত রাজনীতির একটি ধ্রুব সত্য বলেই পরিগণিত হয়। বহুল পরিচিত ও আলোচিত 'মুসলমান ভোট ব্যাংক', বিজেপির 'হিন্দুত্বের রাজনীতি' কিংবা পঞ্জাবের শিখ রাজনীতির অভিমুখ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেখানকার ধর্মীয় সংগঠন এসজিপিসি-র ভূমিকা আবার উত্তরপূর্বের ছোটো ছোটো রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে চার্চের সংযোগ এই বিষয়ে জলজ্যান্ত উদাহরণ বলেই উল্লেখিত।

ধর্মবিশ্বাস ও ভোট নির্ধারণে তার প্রতিষ্ঠিত ভূমিকা দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচিত হয়ে আসছে। আধুনিকতাবাদীদের তরফে একটি অতি পুরাতন বাণী প্রচার করা হয় নির্বাচনের সময় ভোট প্রয়োগে বা সমাজ জীবন নিয়ন্ত্রণে ধর্মের কোনো সক্রিয় ভূমিকা থাকতে পারে না। এই যুক্তিতেই রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনো ধর্মীয় আচরণ সর্বদাই অভিসন্ধিপূর্ণ, অনভিপ্রেত ও রাজনীতি ক্ষেত্রটিকে ধ্বংসাভিমুখী করে তোলে। নেহরুপন্থী রাজনীতিবিদদের একটি অংশ আজও বিশ্বাস করেন জাতি ও ধর্ম আধুনিকতা ও ধর্মনিরপেক্ষতা প্রতিষ্ঠার পক্ষে হানিকারক।

ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও নির্বাচনী রাজনীতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক কিছুটা জটিল বিষয়। সবটাই মিডিয়ার মত অনুযায়ী 'ধর্ম ভারতীয় রাজনীতিতে অন্যতম নির্ণায়ক ভূমিকা নির্ধারণ করে বিশেষ করে নির্বাচনী ফলাফলে, কিন্তু এমন তত্ত্ব পুরোপুরি নির্ভরযোগ্য নয়। অন্যদিকে আধুনিকতাবাদীদের টেনে নেওয়া কাল্পনিক বিভাজনরেখাটিও সহজ সমাধান নয়। সে কারণেই ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি ও আধুনিকতাবাদীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক রাজনীতির ক্ষেত্রে কতটা প্রভাব সৃষ্টিকারী তা বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। একই সঙ্গে ভোটারদের ওপর তারা কতটা নিয়ন্ত্রণকারী তার মূল্যায়নও জরুরি।

ভারতীয় নির্বাচনগুলির একটি ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ এ ব্যাপারে সাহায্য করবে। এটা নিশ্চিত ১৯৫১ সালেই প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রদান একটি বড়ো নীতিগত সিদ্ধান্ত ছিল। এই সময় ভারতীয় সংবিধানের নির্যাস অনুযায়ী সেই নবীন নির্বাচন কমিশন ভারতীয় নির্বাচকমণ্ডলীকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ বিবেকবান গোষ্ঠী হিসেবেই ধরেছিলেন।

কিন্তু ১৯৫০ সালের বাস্তব ছিল অত্যন্ত জটিল। সেই সময়ে ইংরেজ শাসনাধীন ভারত সদ্য ধর্মীয় ভিত্তিতে ভাগ হয়েছিল। পরিণতিতে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও কয়েক লক্ষ উদ্বাস্তু আগমনের কথা সকলেরই জানা। এই পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচনের পরিকল্পনা যেখানে ইতিমধ্যে ধর্মভিত্তিক আত্মপরিচিতির ভাবনা দানা পাকাতে শুরু করেছিল তা নতুন রাস্তার সন্ধান দিল। সকলেই রাজনৈতিক পরিচিতি পেতে উন্মুখ হয়ে উঠল।

এ সময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি--- মসজিদ, মন্দির, মঠ, চার্চ এগুলি তো সবই সম্প্রদায়গত মিলনস্থল। সে কারণে এদের সব সময়েই রাজনৈতিক সমর্থনের ভাণ্ডার ভরাতে তৈরি করা যেতে পারে। একই উদ্দেশে ধর্মীয় ক্ষেত্রে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত মাতব্বরদের সঙ্গে মেলামেশা করে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা তাদের

সমর্থন আদায়ের চেষ্টা শুরু করেছিল।

৫০-এর দশকে সমাজতত্ত্ববিদ শ্রীনিবাস ও বেইলী এই ক্ষেত্রে ব্যাপক সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছিলেন 'ভারতের গ্রাম্য জনসাধারণের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে এক প্রকার ডাক্তার-রোগী ধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। প্রধান বা প্রভাবশালী সম্প্রদায়ের প্রধানরা তাঁদের স্বপক্ষে বড়ো সংখ্যার মানুষদের অনুগামী করে তুলতে পারতেন। এই গ্রামীণ সংগঠনগুলি রাজনীতিবিদদের কাছে ভোট ব্যাংক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছিল। এবং ভোটের সময় তাঁরা সরাসরি তাদের ভোট চাইতে যেত। এই বড়ো বড়ো প্রতিষ্ঠান পরিচালকরা কেউ পরবর্তীকালে বাসের লাইসেন্স, চাল কল, মেডিক্যাল ও ভালো প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিজেদের অধীন লোকেদের ছেলেপুলেদের জন্য নির্দিষ্ট আসন দাবি করতেন।'

এই সামাজিক সংগঠনের মাতব্বর বাদ দিলে ধর্মীয় সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও একথা সত্যি। রাজনৈতিক নেতারা তাদের দলের প্রার্থীর পক্ষে ভোট টানতে ধর্মগুরুদের শরণাপন্ন হতেন। এর পর এই প্রতিশ্রুত সমর্থন প্রাপ্ত বিজয়ী বিধায়ক বা সাংসদ ধর্মীয় প্রধানদের প্রত্যক্ষ প্রতিদানে সেই সময় অতি দ্রুত সম্প্রসারিত পাবলিক সেক্টর সংস্থাগুলিতে লোভনীয় পদ পাইয়ে দিতেন। ওয়াকফ বোর্ডের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন মন্দিরকে দান করা জনগণের জমিজমা, মঠকে প্রদত্ত সম্পত্তির অছির পদ পাইয়ে দেওয়া ছাড়াও বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি পাইয়ে দেওয়াও বাদ যেত না। এইগুলিই মূলত পারস্পরিক স্বার্থ-ঋণ দেওয়া নেওয়ার চালু পদ্ধতি ছিল। এই কৌশলগত ব্যবস্থাপনায় কিন্তু আমাদের গৃহীত সংবিধানের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র বজায় রেখে ধর্মীয় মাতব্বরদের সঙ্গে চলতে কোনো অসুবিধে হতো না। রাজনৈতিক দার্শনিক রাজীব ভার্গব এই পদ্ধতিকে 'রিলিজিয়ানস সেকুলারিজম' আখ্যা দিয়েছেন।

১৯৭০ সালের শেষার্ধে ভারত রাষ্ট্রের মধ্যে উদ্ভূত নতুন সমস্যা রাজনৈতিক নেতৃদেরকে ধর্মীয় কর্তাদের সঙ্গে মাখামাখির বিষয়টা পুনর্বিবেচনার দিকে নিয়ে গেল। ধর্মীয় নেতাদের 'নিঃশব্দ গোপন সহযোগীর' ভূমিকা থেকে একেবারে ছাপ মারা নির্দিষ্ট প্রতিনিধি বলে মান্যতা দেওয়া হলো।

মনে পড়বে জামা সমজিদের ইমাম আবদুল্লা বুখারি বিখ্যাত হয়ে উঠলেন তাঁর নির্বাচনী সময়ের 'ফতোয়া' দেওয়ার জন্য। ওই ফতোয়া অর্থাৎ নির্দেশই হলো চূড়ান্ত। এবং আইনগ্রাহ্য। এই সূত্রে দিল্লির জামা মসজিদ প্রায় মুসলমান রাজ্যর কেন্দ্রবিন্দুতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। একইভাবে জারনেল সিংহ ভিন্দ্রেনওয়ালে উঠে এলেন শিখ রাজনীতির মুখিয়া বা প্রধান হিসেবে। একই পদ্ধতিতে স্বর্ণমন্দির হয়ে উঠল শিখ রাজনীতির প্রধান চর্চাস্থল। একই সঙ্গে একটু পরে ৮০-র দশকে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উত্থান। এই ধর্মের ভিত্তিতে রাজনীতিরই বৃহত্তর পরিসর।

সরকারি তরফ থেকে ধর্মীয় নেতাদের এইভাবে খোলাখুলি গ্রহণযোগ্যতা দেওয়া ও রাজনীতির ময়দানের বৈধ খেলোয়াড় হিসেবে ঘোষণা করায় তাঁরা রাজনৈতিক বাজি ধরবার নির্দিষ্ট মতে নিজেকে নিয়োজিত (স্টক হোল্ডার) করার যোগ্যতা পেয়ে গেলেন। নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকারও পেলেন। এর ফলে স্বাভাবিক গুচ্ছ গুচ্ছ মৌলানা, পুরোহিত, মন্দির প্রধান এবং স্বঘোষিত পবিত্র ধর্মীয় পুরুষ বা মহিলা নির্বাচন জিতে বিধায়ক বা সাংসদও হয়ে গেলেন। বিষয়টা এত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠল যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল রাজ্যসভার পরোক্ষ রাস্তা ধরে তাঁদের সংসদে নিয়ে আসতে লাগলেন। দেখতে হবে এই ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা কি সঠিক ভাবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলতে পারেন। সিএসডিএস লোকনীতি সমীক্ষা (২০১৫) এক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এখানে প্রশ্ন করা হয়েছে বা মতামত নেওয়া হয়েছে এমন মানুষজনের গরিষ্ঠাংশ বলেছেন ধর্মীয় নেতাদের দেওয়া উপদেশকে সম্মান করা উচিত, কিন্তু সক্রিয় রাজনীতিতে মূলত ধর্মযাজক প্রমুখ ব্যক্তিরা কতদূর উপযুক্ত হবেন এ নিয়ে ওনাদের মনে দো-টানা আছে। উত্তরদাতাদের একটি গরিষ্ঠাংশ ধর্মীয় নেতাদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ আদৌ চান না এবং তাঁরা কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থনে কাজ করুন এটাও চান না। এমনকী কোন দলকে নির্বাচনে সমর্থন দেওয়ার মতেরও তাঁরা বিরোধী। এই সমীক্ষা থেকে যে উপসংহার উঠে আসছে তা হলো আমাদের রাজনৈতিক নেতারা ও দল ধর্মের প্রতি সম্মান আর ধর্মকে নির্দিষ্ট উদ্দেশে ব্যবহার করার তফাতটা বুঝতে চাইছেন না।

(লেখক দিল্লিস্থিত সিএসডিএস-র অধ্যাপক)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার যে সকল বার্ষিক গ্রাহকের মেয়াদ শেষ হয়েছে বা শেষ হতে চলেছে তাঁদের কাছে বিনীত নিবেদন, আপনারা পরবর্তী বছরের জন্য গ্রাহকমূল্য ৭০০ টাকা অবিলম্বে জমা দিয়ে গ্রাহকপদ নবীকরণের মাধ্যমে আমাদের সহযোগিতা করুন। স্বস্তিকার প্রতিনিধির মাধ্যমেও টাকা পাঠাতে পারেন।

নতুন গ্রাহক হলে সম্পূর্ণ নাম-ঠিকানা, ফোন নম্বর (পিন কোড সহ) অবশ্যই পাঠাবেন।

ব্যবস্থাপক, স্বস্তিকা

শোকসংবাদ

ডেবরা খণ্ডের বৌদ্ধিক প্রমুখ বিশ্বজিৎ মণ্ডলের বাবা চন্দ্রকান্ত মণ্ডল গত ২২ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। তিনি তাঁর সহধর্মিণী, ৪ পুত্র, ২ কন্যা ও নাতি-নাতনিদের রেখে গেছেন।

মোদীর ‘মন কী বাতে’র সাফল্য দুনিয়াজোড়া, একশোতম পর্ব সম্প্রচারিত জাতিসঙ্ঘেও

গত পয়লা মে পশ্চিমবঙ্গের একটি জনপ্রিয় প্রভাতী নৈদিকের প্রথম পাতার হেডলাইন ছিল : ‘দেশের মন কি ছুঁলেন মোদী, প্রশ্ন বিরোধীদের’। প্রতিবেদনে বিরোধী নেতাদের নানা আস্ফালন উঠে এসেছে— দেশের বেকারত্ব, আর্থিক দুর্নীতি, অর্থসংকট নাকি এমনি ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছেছে, অথচ মোদী এ ব্যাপারে একেবারে নিশ্চুপ যে বিরোধী দল এই অনুষ্ঠানকে ‘মৌন কী বাত’ বলে কটাক্ষ করতেও ছাড়েনি। ঘটনা হলো, গত ৩০ এপ্রিল সম্প্রচারিত হয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠানের শততম পর্ব। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর সে বছরই ৩ অক্টোবর থেকে শুরু হয় রেডিয়োতে ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠান। তবে শুধু ভারতেই নয়, দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠানের এই বিশেষ পর্বটি লাইভ সম্প্রচারিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদর দপ্তরে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে। এ ব্যাপারে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি অনুষ্ঠান শুরুর আগে এক টুইট বার্তায় লেখেন, ‘রাষ্টসঙ্ঘের সদর দপ্তরে ট্রাস্টিশিপ কাউন্সিল চেম্বারে ৩০ এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী মোদীর ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠানের একশোতম পর্ব লাইভ সম্প্রচার করা হবে। এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের জন্য প্রস্তুত হন।’ টুইট বার্তায় এও লেখা হয়েছিল, ‘মন কী বাত অনুষ্ঠানটি জাতীয় ঐতিহ্য হয়ে উঠেছে। প্রতি মাসে লক্ষ লক্ষ লোককে ভারতের উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করছে এই অনুষ্ঠান।’ এদিকে লন্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনেও মোদীর ‘মন কী বাত’ সম্প্রচারিত হয়েছে। স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছ’টার সময় ‘মন কী বাতে’র স্ক্রিনিঙের উদ্যোগ নেয় ভারতীয় হাইকমিশন।

ইতিপূর্বে কেন্দ্র সরকারের তরফে জানানো হয়েছিল, দেশের শতকোটি মানুষ একবার না একবার হলেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর এই ‘মন কী বাত’ অনুষ্ঠান শুনেছেন। প্রায় তেইশ কোটি মানুষ নিয়মিত ‘মন কী বাত’ শোনেন বলে জানানো হয় আইআইএম রোহতকের করা একটি সমীক্ষায়। সমীক্ষা প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছিলেন প্রসার ভারতী সিইও গৌরব দ্বিবেদী। তাতে দেখা গিয়েছে, এই শ্রোতাদের মধ্যে যুবকদের, যাঁদের বয়স উনিশ থেকে চৌত্রিশের মধ্যে, তাঁদের সংখ্যাই বাষট্টি শতাংশ। অর্থাৎ যুবকের মধ্যে এই অনুষ্ঠান ভালোই সাড়া ফেলেছে।

অনুষ্ঠানের আগের দিন ‘মন কী বাত’ নিয়ে একটি প্রতিবেদনও প্রকাশ করা হয় প্রসার ভারতীর তরফে। গৌরব দ্বিবেদী গত ২৯ এপ্রিল প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেন। সেই প্রতিবেদন প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সরকারি ওয়েবসাইট মাইগভ-এর সিইও আকাশ ত্রিপাঠী এবং হাল্ট ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস স্কুল এবং হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ড. মার্ক এসপোসিটো। এছাড়াও আইএফসি-এর চেয়ারম্যান ড. অমিত কাপুর, বিল অ্যান্ড মেলিন্ডা গেটস ফাউন্ডেশনের কান্ট্রি ডিরেক্টর হরি মেনন, সোশ্যাল প্রোগ্রেস ইম্পেরেটিভ-এর সিইও ড. মাইকেল গ্রিনও উপস্থিত ছিলেন উক্ত অনুষ্ঠানে।

এতদিন দেশের মধ্যে বাইশটি ভাষায় সম্প্রচারিত হয়েছে ‘মন কী বাত’। এবারের একশোতম পর্বের বিশেষ অনুষ্ঠান ১১টি আন্তর্জাতিক ভাষাতেও সম্প্রচারিত হলো।

এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে প্রসার ভারতীর সিইও বলেন, ‘মন কী বাত’-এর প্রভাব অতুলনীয়। সাম্প্রতিক একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, এই অনুষ্ঠানটি একশো কোটি শ্রোতা অন্তত একবার করে শুনেছেন বা দেখেছেন। অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো ২২টি ভারতীয় ভাষা এবং ১১টি বিদেশি ভাষায় অনুবাদ করেছে মন কী বাতের। ইংরেজি ছাড়াও অনুষ্ঠানটি ফরাসি, চীনা, ইন্দোনেশিয়ান, তিব্বতি, বার্মিজ, বেলুচি, আরবি, পশতো, ফার্সি, দারি এবং সোয়াহিলি ভাষায় সম্প্রচারিত হয়েছে।’

‘মন কী বাত’-এর শততম পর্ব উপলক্ষ্যে অবশ্য কম আয়োজন হয়নি। কেন্দ্রীয় শাসক দল বিজেপির তরফে সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচারের উত্তম ব্যবস্থা ছিল। এতদিন দেশের মধ্যে বাইশটি ভাষায় সম্প্রচারিত হয়েছে ‘মন কী বাত’। এবারের একশোতম পর্বের বিশেষ অনুষ্ঠান ১১টি আন্তর্জাতিক ভাষাতেও সম্প্রচারিত হলো। শুধু তাই নয়, আগেই বলা হয়েছে যে রাষ্ট্রপুঞ্জেও সম্প্রচারিত হলো মোদীর মনের কথা। প্রতি রাজ্যের রাজ্যপালও ‘মন কী বাতে’র শততম পর্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখেছেন, শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর মোটিভেশনাল বক্তব্য। নানান চমকের পাশাপাশি এবার বলিউড তারকারাও তাদের মতামত জানিয়েছেন।

‘মন কী বাত’-এর প্রশংসায় পঞ্চমুখ একতা কাপুর থেকে মাধুরী দীক্ষিত-সহ বিভিন্ন সেলিব্রিটিরা। □

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে মতান্তর হলেও মনান্তর কোনোদিন হয়নি

অধ্যাপক, ড. সমর সরকার

অনুজ শরৎচন্দ্রের প্রয়াণে কবি ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ তারিখে লিখেছেন—

'যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে।
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।'

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৬১ খ্রিস্টাব্দের ৭ মে, জোড়াসাঁকো ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ১৮৭৬ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর হুগলি জেলার দেবানন্দপুরের একটি ছোট্ট গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সমসাময়িক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের থেকে বয়সে প্রায় ১৫ বছরের বড়ো। তাঁরা সম্ভবত বঙ্গ তথা ভারতের জনপ্রিয় কবি ও সাহিত্যিক। তবে পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থান, বেড়ে ওঠা, ব্যক্তিত্ব, শ্রেণী, চেতনা, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক বোধ এবং সর্বোপরি দৃষ্টিভঙ্গিতে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল। কিন্তু এই সমস্ত পার্থক্য সত্ত্বেও এবং তাঁদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিত্বের সংঘাত সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত ছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এমন একজন ব্যক্তিত্ব যার ব্যাপ্তির কোনো সীমারেখা নেই। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদক্ষেপেই যেন প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন তিনি— কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, সুরকার, চিত্রশিল্পী, নাট্যকার দার্শনিক-সহ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন হাস্যরসিকও।

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি 'অপরাজেয় কথাশিল্পী' হিসেবে সুখ্যাত। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার শৈশব, কৈশোর কাটিয়েছিলেন মামাবাড়ি বিহারের ভাগলপুর শহরে। সেখানে তাঁর বাবা মতিলাল চট্টোপাধ্যায়ের কড়া নির্দেশ ছিল একটাই, মন দিয়ে পড়াশোনা কর। পড়াশোনা শেষ করেই তোমাকে উকিল হতে হবে। সুতরাং সেখানে গল্প, উপন্যাস পড়া তো দূরের কথা, স্কুলবই ছাড়া অন্য বই পড়া ছিল একদম নিষিদ্ধ। ঘটনক্রমে একদিন এক আত্মীয় ভাগলপুরের বাড়িতে বেড়াতে এলেন— ভদ্রলোক ছিলেন সাহিত্য প্রেমিক। তিনি একদিন বাড়ির ছোটোদের একত্র করে পড়ে শোনালেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গীতিনাট্য 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। ধীরে ধীরে ওই আসরে উপস্থিত হলেন ছোট্ট শরৎচন্দ্র। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথের লেখার সঙ্গে পরিচিতি।

যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্রের পাদুকাপুরাণ নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেন— 'যিনি বাঙ্গালির জীবনের আনন্দ বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিককালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি'।

আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম কবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে পরিচিত হলেন? সে এক মজার ঘটনা! শরৎচন্দ্র তার সমস্ত লেখা, যার মধ্যে রয়েছে বড়ো গল্প বিখ্যাত 'বড়দিদি', তার মহাবিদ্যালয়ের দুই বন্ধু শৈলেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় ও বিভূতিভূষণ ভট্টের কাছে কলকাতায় রেখে দিয়ে ১৯০৩ সালে ভাগ্যের সন্ধানে রেঙ্গুন শহরে পাড়ি দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি ১৪ বছর কাটিয়েছিলেন। এই সময়েই কলকাতা শহরে 'ভারতী পত্রিকা' প্রকাশ করার জন্য জোর কদমে প্রস্তুতি চলছিল। বন্ধু সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায় শরৎচন্দ্রের কাছে অনুমতি না নিয়েই ধারাবাহিকবাবে 'বড়দিদি' গল্পটি ছাপাতে দিয়েছিলেন ভারতী পত্রিকায়। কিন্তু পত্রিকায় কোনো সংখ্যাতে লেখক হিসেবে শরৎচন্দ্রের নাম ছাপা হলো না।

সেই সময় বঙ্গদর্শন নামে এক বিখ্যাত পত্রিকা ছিল। পত্রিকার সহ-সম্পাদক শৈলেশ চন্দ্র মজুমদার একদিন সটান হাজির হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে। বললেন আপনি এমন একটি গল্প আমাদের পত্রিকায় দিলেন না। দিয়ে দিলেন ভারতী পত্রিকায়? প্রশ্ন শুনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবাক হয়ে বললেন— ভাই আমি তো এমন কোনো গল্প ভারতী পত্রিকায় ছাপাতে দিইনি। তবে বড়দিদি গল্পটি আমি পড়েছি ভারতী পত্রিকায়। লেখক খুব শক্তিশালী। সেই বছরই পুজোর সময় ভারতী পত্রিকা বড়দিদি গল্পের লেখকের নাম প্রকাশ করল। তা থেকেই রবীন্দ্রনাথ জানতে পারলেন ওই শক্তিমান, বুদ্ধিদীপ্ত সাহিত্যিকের নাম। তিনি আর কেউ নন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র দুজনেই যৌবনে তাঁদের প্রখ্যাত পূর্বসূরি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য রচনার মূল বিষয়বস্তু ছিল সত্যবাদিতা, সহিষ্ণুতা ও দ্ব্যর্থহীনতা। রবীন্দ্রনাথের পরিণত যৌবনের একটি প্রধান উপন্যাস চোখের বালি (১৯৩০)। এই উপন্যাসটি বাংলা উপন্যাসের ইতিহাসে এক নতুন দিগন্তের সূচনা করে। এই উপন্যাসের বিষয়বস্তু ছিল এক তরুণী বিধবা বিনোদিনী এবং পুরুষের হৃদয় জয় করার জন্য তার অদম্য বাসনা। নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করে এই উপন্যাসে লেখক মানব মনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে ঝাঁপ দেন এবং রচনাটি বাংলা উপন্যাসের একটি দিকচিহ্ন স্বরূপ।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি সম্পূর্ণভাবে মুখস্থ করে তার গদ্যশৈলীকে নকল করতে চেষ্টা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল শরৎচন্দ্রের কাছে আকর্ষণ ও বিকর্ষণ দুটিরই কারণ ছিল। এই উপন্যাসটি শরৎচন্দ্রের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল। কিন্তু প্রধান চরিত্র রোহিণীকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য তিনি সাহিত্য সম্রাটের প্রতি বিরূপ হন।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য, কবিতা যেমন অবিভূত হয়ে পড়তেন, শুনতেন, ঠিক তেমনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্রের সমস্ত গল্পই খুব মনোযোগ সহকারে পড়তেন এবং শিক্ষক সুলভ বিচারও করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা চোখের বালির অনেক পৃষ্ঠায় তলায় ২৪ বার দাগ দিয়েছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং দশবার রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড় ছোটো গল্পটি পাঠ করেছিলেন। অমল হোমকে একটি চিঠি প্রেরণ করেছিলেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় আর তাতে মন্তব্য করেছিলেন যে, তার থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বড়ো ভক্ত আর কেউ নেই।

বাহ্যিকভাবে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের সম্পর্ক ছিল অনেকটা গুরু শিষ্যের সম্পর্কের মতো। রবীন্দ্রনাথের ৭০তম জন্মদিবসে শরৎচন্দ্র মন্তব্য করেছেন, আর কোথাও না

বাংলা সাহিত্যের এই দুই মহিরুহের মধ্যে মতান্তর হলেও মনান্তর কোনোদিন হয়নি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন অনুজ সাহিত্যিকের প্রতি, তা অকৃত্রিম স্নেহ, ভালোবাসারই প্রকাশ।

হোক, সাহিত্যে গুরুবাদ আমি মানি। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এই দুজন পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার পর রাজনৈতিক এবং বিভিন্ন সাহিত্যের বিষয় নিয়ে মতান্তর ঘটে। যদিও শেষ পর্যন্ত তাঁদের মধ্যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটেছিল।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন কোনো উপন্যাস লিখতেন তখন সেটা শান্তিনিকেতনে গুণীজন সমাবেশে পড়ে শোনাতেন। তার আসরে মাঝে মধ্যেই যোগদান করতেন শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। একবার এক মজার ব্যাপার হয়েছিল, এমনই একদিন শরৎবাবু ওই রকম এক আসরে এসেছিলেন এবং তার পাদুকা জোড়া চুরি হয়ে গিয়েছিল। তারপর একদিন শরৎচন্দ্র অগত্যা নতুন জুতো দুটো কাগজে মুড়ে সেটা বগলদাবা করে আসরে প্রবেশ করছেন, ঠিক সেই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্রকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, শরৎ তোমার বগলে কি ওটা পাদুকাপুরাণ? রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মুখের এই কথা শুনে শরৎচন্দ্র-সহ আসরের সকলেই হেসে একটা মজার আসর তৈরি হয়েছিল। দুজনের মধ্যে যেমন হতো মজা, তেমনি ছিল দ্বন্দ্ব। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পথের দাবী উপন্যাস যখন ঔপনিবেশিক ব্রিটিশরাজ নিষিদ্ধ করে দিল, সেই সময়ে শরৎচন্দ্র মনেপ্রাণে চেয়েছিলেন এই দুঃসময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যেন তার পাশে থাকেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তিনি কাছে পাননি বা পাশে পাননি। বরং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্রের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখলেন, যার সারমর্ম হলো— আঘাত করলে প্রত্যাঘাত আসবেই। অর্থাৎ তুমি যে শক্তির বিরুদ্ধে লিখেছ প্রত্যাঘাত আসবেই। তোমাকে আরও শক্তিশালী এবং শক্ত হতে হবে।

শরৎচন্দ্রের জীবনের শেষের কয়েকটা বছর খুব শারীরিক অসুস্থতায় ভুগছিলেন। হঠাৎ শরৎচন্দ্রের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ায় সংবাদ শুনে রবীন্দ্রনাথ তখন এক পত্র লিখলেন, 'কল্যাণীয়েষু, শরৎ। রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালে আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমার আরোগ্য লাভের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে। ইতি ৩১.১২.৩৭।'

বাংলা ভাষাভাষী ভক্তদের আবেগকে চোখের জলে ভিজিয়ে, রবীন্দ্রনাথের স্নেহের অনুজ শরৎচন্দ্র ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮ সালে না ফেরার দেশে চলে যান।

যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শরৎচন্দ্রের পাদুকাপুরাণ নিয়ে হাসি ঠাট্টা করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সংবাদ শুনে ইউনাইটেড প্রেসের প্রতিনিধিকে বলেন— 'যিনি বাঙ্গালির জীবনের আনন্দ বেদনাকে একান্ত সহানুভূতির দ্বারা চিত্রিত করেছেন, আধুনিককালের সেই প্রিয়তম লেখকের মহাপ্রয়াণে দেশবাসীর সঙ্গে আমিও গভীর মর্মবেদনা অনুভব করছি'।

বাংলা সাহিত্যের এই দুই মহিরুহের মধ্যে মতান্তর হলেও মনান্তর কোনোদিন হয়নি। শরৎচন্দ্রের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথ যে শোকবার্তা পাঠিয়েছিলেন অনুজ সাহিত্যিকের প্রতি, তা অকৃত্রিম স্নেহ, ভালোবাসারই প্রকাশ।

□

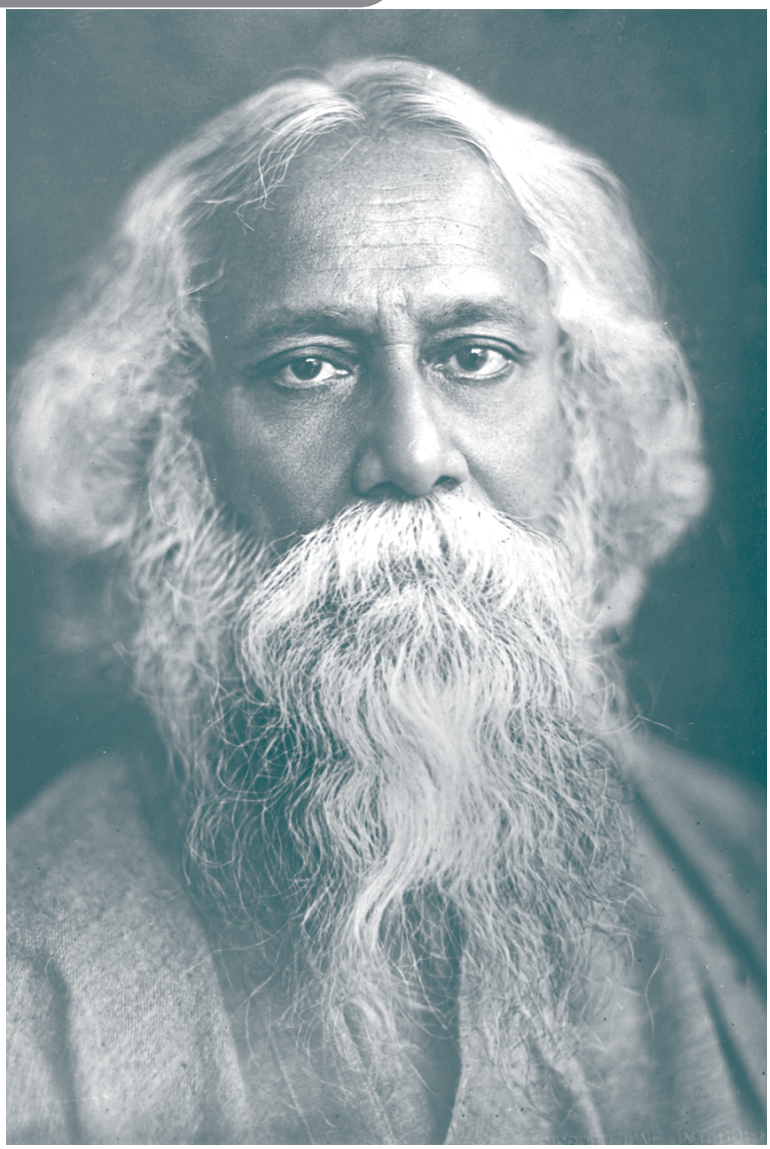

ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের অসারতা বুঝেছিলেন রবীন্দ্রনাথ

পিন্টু সান্যাল

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে নেশন, ন্যাশনালিজম, নেশন স্টেট, স্টেট নেশন ইত্যাদি শব্দগুলি বহুল প্রচারিত। একটি জনগোষ্ঠী যখন একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ডকে আশ্রয় করে একসঙ্গে বসবাস করে এবং তাদের মধ্যে একসঙ্গে থাকার বাসনা ও নিজেদের ঐক্যকে রক্ষা করার চেতনা তৈরি হয় তখন তাকে নেশন বা জাতি বলা যায়। সেই জাতি যদি একটি সার্বভৌম রাজনৈতিক ক্ষমতাসম্পন্ন গঠনতন্ত্র অর্থাৎ স্টেট-এর মধ্যে থাকে তাহলে তাকে nation-state বলে। আবার একটি State-এর মধ্যে যদি একাধিক জনগোষ্ঠী নিজেদের জাতিগত পরিচয় অক্ষুণ্ণ রেখে বসবাস করে তাহলে তাকে state-nation বলা হয়। প্রত্যেক ভাষার সঙ্গে তার সংস্কৃতি জড়িয়ে থাকে বা বলা যায় কোনো শব্দের অর্থকে বুঝতে তার জন্মদাত্রী সংস্কৃতিকে উপলব্ধি করতে হবে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনা করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন, নেশন শব্দ আমাদের ভাষায় নেই, আমাদের দেশে ছিল না। সম্প্রতি ইউরোপীয় শিক্ষাগুণে ন্যাশনাল মহত্বকে আমরা অত্যধিক আদর দিতে শিখিয়াছি। অথচ তাহার আদর্শ আমাদের অন্তঃকরণের মধ্যে নেই। ইউরোপীয় দার্শনিকরা জাতি গঠনের মূল হিসেবে কখনো ভাষাগত ঐক্যের কথা বলেছেন, কখনো রাজতন্ত্রকে 'জাতি' গঠনের আধার বলে ব্যাখ্যা করেছেন।

ভারতবর্ষের ভাষাগত বিভিন্নতা, আচার-অনুষ্ঠান পালনের বিভিন্নতা বরাবরই তাদের আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু তারা ইউরোপীয় 'জাতি' গঠনের তত্ত্ব দিয়ে ভারতবর্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁরা ইউরোপীয় 'রিলিজিয়ন'-এর চশমা দিয়ে ভারতবর্ষকে দেখতে গিয়ে ভারতবর্ষের ভাষা-পোশাক-আচারের বিভিন্নতার মধ্যে থাকা ঐক্যসূত্রকে চিনতে পারেননি।

ইউরোপীয় দেশগুলির লিখিত বা লোককথায় বা উপাসনা পদ্ধতিতে (Religion) অতীতকালের যে কাহিনি পাওয়া যায় ভারতবর্ষের শাস্ত্রে তার চেয়ে কয়েক হাজার বছরের প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সভ্যতার সমাজ ব্যবস্থা, শিল্প, বিজ্ঞান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় এবং এই সমস্ত জ্ঞানের ইতিহাস লিখতে গেলে ভারতবর্ষকে প্রথম অধ্যায়েই স্থান দিতে হয়। ইউরোপীয় দেশগুলি পৃথিবীর মানচিত্রে আত্মপ্রকাশ করার কয়েক হাজার বছর আগে ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমারেখা বিষ্ণুপুরাণ-সহ বিভিন্ন শাস্ত্রে, কাব্যে সুস্পষ্ট রূপে বর্ণিত হয়েছে। এই অবস্থায় ইউরোপীয় জাতির ঐক্যসূত্র অনুযায়ী ভারতের জাতীয়তাকে ব্যাখ্যা করতে গেলে তা দুর্বোধ্য

মনে হওয়া স্বাভাবিক।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'ভারতবর্ষীয় সমাজ' (আত্মশক্তি) প্রবন্ধে এই ব্যর্থতার কথা বলেছেন এইভাবে— 'এই লোকচিত্তের একতা সব দেশে একভাবে সাধিত হয় না। এই জন্য ইউরোপীয়ের ঐক্য ও হিন্দুর ঐক্য এক প্রকারের নহে, কিন্তু তাই বলিয়া হিন্দুর মধ্যে যে একটা ঐক্য নাই, সে কথা বলা যায় না। সে ঐক্যকে ন্যাশনাল ঐক্য না বলিতে পার, কারণ নেশন ও ন্যাশনাল কথাটা আমাদের নহে, ইউরোপীয় ভাবের দ্বারা তাহার অর্থ সীমাবদ্ধ হইয়াছে।'

ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য দেশগুলিতে জাতীয়তাবাদের ধারণা মূলত রাজনৈতিক ও সার্বভৌম ক্ষমতা ভিত্তিক। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধের ভিত্তি সংস্কৃতি যা তার ভাষা-মত- পরিধানের বিভিন্নতাকে ছাপিয়ে গেছে এবং এই সংস্কৃতির মূল নিঃসন্দেহে তার ধর্ম; হিন্দুত্বের মধ্যে প্রোথিত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশি সমাজ প্রবন্ধে এই ধারণাটিকেই সুসংবদ্ধ করেছেন— 'হিন্দুধর্ম সমাজের প্রত্যেককে পঞ্চ যজ্ঞের দ্বারা ঋষি, পিতৃপুরুষ, সমস্ত মনুষ্য ও পশুপক্ষীর সহিত আপনার মঙ্গলসম্বন্ধ স্মরণ করিতে প্রবৃত্ত করিয়াছে। ইহা যথার্থরূপে পালিত হইলে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকের পক্ষে, সাধারণভাবে বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলকর হইয়া উঠে। ...ভারতবর্ষের মধ্যে একটি বাঁধিয়া তুলিবার ধর্ম চিরদিন বিরাজ করিতেছে। নানা প্রতিকূল ব্যাপারের মধ্যে পড়িয়াও ভারতবর্ষ একটা ব্যবস্থা করিয়া তুলিয়াছে, তাই আজও রক্ষা পাইয়াছে।'

বিগত ২০০০ বছরে ইউরোপের ও আরবের ভাবনা একটিমাত্র উপাস্য, একটিমাত্র ভাষা, এক রাজার অধীনতাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হতে গিয়ে পৃথিবীর ইতিহাসকে রক্তাক্ত করেছে। ইউরোপে চার্চ ও রাজতন্ত্রের সংঘাতের রফাসূত্র হিসেবে সেক্যুলারিজমের জন্ম হয়েছে। ইউ কে (UK)-এর হাউস অব লর্ডস-এ ইংল্যান্ডের বিশপদের জন্য ২৬টি আসন সংরক্ষিত আছে। এমনকী ২০০১-এ ইংল্যান্ড সরকার আরও একধাপ এগিয়ে চার্চ-রাষ্ট্রের বিচ্ছিন্নকরণকে দুর্বল করতে ও হাউস অব কমনসে চার্চের প্রতিনিধিত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে House of Commons (Removal of clergy disqualification) Act পাশ করে। আব্রাহামিক রিলিজিয়ন (খ্রিস্টীয় মত, ইসলামি মত) বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী— এইভাবে মানবসমাজকে ভাগ করে দেখে। বিশ্বাসের উপরে বিভেদের প্রাচীর নির্মাণ করে বিশ্বকে শান্তি দেওয়া যে যায় না, ইতিহাসই তার প্রমাণ।

ভারতবর্ষে রাজা শাসনকাজ পরিচালনা ও অপরাধীদের শাস্তি দানের ক্ষেত্রে সর্বময় কর্তা হলেও রাজা নিজে সমাজের প্রচলিত নিয়ম নীতি অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য ছিলেন। সমাজের কল্যাণে রাজা কর্তব্য পালন করলে তিনি ধার্মিক হিসেবে পরিচিত হতেন। অধার্মিক রাজাকে শাস্তি দেবার উদাহরণও আছে। যেমনটি আমরা দেখতে পাই চাণক্যের মার্গদর্শনে নন্দরাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের উত্থানে। তাই ভারতবর্ষের ঐক্যের মূলে সমাজ আর সমাজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হতো তা হলো ধর্ম। এই ধর্ম ইউরোপের রিলিজিয়ন নয় যার একটিমাত্র উপাস্য ও একটি মাত্র ক্ষমতার কেন্দ্র ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই পার্থক্যকে স্পষ্ট করে বলেছেন— 'পলিটিকস্ এবং নেশন কথাটা যেমন ইউরোপের কথা, ধর্ম কথাটাও তেমনি ভারতবর্ষের কথা। পলিটিকস্ এবং নেশন কথাটার অনুবাদ যেমন আমাদের ভাষায় সম্ভবে না তেমনি ধর্ম শব্দের প্রতিশব্দ ইউরোপীয় ভাষায় খুঁজিয়া পাওয়া অসাধ্য। এই জন্য ধর্মকে ইংরেজি রিলিজিয়ন রূপে কল্পনা করিয়া আমরা অনেক সময়ে ভুল করিয়া বসি'। —(ধম্মপদং, ভারতবর্ষ)

তাই ভারতবর্ষের শাসক পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সমাজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিচারব্যবস্থা, জীবনপদ্ধতির গতি মন্থর হয়নি বা আপন প্রয়োজনের তাগিদে রাজার মুখাপেক্ষী থাকেনি। রাজা পরিবর্তন হলেও তার প্রভাব সমাজের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেনি। কারণ সমাজের ধর্মে কখনোই হস্তক্ষেপ হয়নি। 'আমাদের সমাজের গোড়াকার জিনিসগুলি কোনো রাজক্ষমতার স্বেচ্ছাকৃত সৃজন নহে। আমাদের জনসাধারণ নিজের জীবনকে এইরূপ শারীরতন্ত্রের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। কোনো গভর্নমেন্ট তাহাকে গড়ে নাই, কোনো গভর্নমেন্ট তাহার বদল করিতে পারে নাই। এক কথায় আইন জিনিসটা উপর হইতে আমাদের মাথায় চাপানো হয় নাই— তাহা আমাদের জাতিগত জীবনের মূলসূত্র এবং যাহা শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ আছে তাহাই ব্যবহারে প্রবর্তিত হইয়াছে।' —'চীনেম্যানের চিঠি' প্রবন্ধে বলেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বদেশি সমাজ প্রবন্ধে দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের এই ভাবেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। ইউরোপের Nationalism-এর কেন্দ্রে Religion ও King-এর যে সার্বভৌম শক্তি উপর থেকে সমাজের জীবনপদ্ধতিকে নিয়ন্ত্রিত করত রবীন্দ্রনাথ তার প্রতি বীতস্পৃহ ছিলেন। তিনি নিজের জীবদ্দশায় দুটো বিশ্বযুদ্ধ দেখেছিলেন আর ইউরোপের ভবিতব্য কবি তার আগেই বলেছিলেন— 'ইউরোপীয় সভ্যতার মুলভিত্তি রাষ্ট্রীয় স্বার্থ যদি এত অধিক স্ফীতিলাভ করে যে, ধর্মের সীমাকে অতিক্রম করিতে থাকে, তবে বিনাশের ছিদ্র দেখা দিবে এবং সেই পথে শনি প্রবেশ করিবে। স্বার্থের প্রকৃতিই বিরোধ। ইউরোপীয় সভ্যতার সীমায় সীমায় সেই বিরোধ উত্তরোত্তর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছে। পৃথিবী লইয়া ঠেলাঠেলি কাড়াকাড়ি পড়িবে, তাহার পূর্বসূচনা দেখা যাইতেছে' (প্রাচ্য ও

বিদেশে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে।

পাশ্চাত্য সভ্যতা)।

আপন রাষ্ট্রীয় স্বার্থ, আপন জাতিগত উৎকর্ষতার মিথ্যা অহংকারে ইউরোপীয় নেশনগুলি পৃথিবীতে প্রাণহানি দিয়েছে আর ভবিষ্যতে এই ধরনের যুদ্ধের জন্য অস্ত্রভাণ্ডার বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা দিয়েছে। কখনো state-religion-কে বিশ্বব্যাপী প্রসার, কখনো আপন কলকারখানার উদ্বৃত্ত দ্রব্যের বাজার খুঁজতে, আবার কখনো আপন প্রয়োজনীয় সামগ্রীর খোঁজে ইউরোপীয় ন্যাশনালিজম বিশ্বশান্তির অন্তরায় হয়েছে। ঔপনিবেশিকতার মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সমাজ-সংস্কৃতির ভাষার বিলুপ্তির কারণ হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ব্যক্তি মানুষকে শুধুমাত্র একটি কৃত্রিম মানচিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আপন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের সংকীর্ণতায় বন্দি মানুষ হিসেবে দেখেননি। তিনি চেয়েছিলেন মানবতার সীমারেখা মানচিত্রের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে দেশের মানুষকে বিশ্ব মানবে পরিণত করবে আর তখনই মানবাত্মা বিশ্বাত্মার সঙ্গে এক হয়ে সত্যিকারের স্বাধীন হবে। রবীন্দ্রনাথের এই চিন্তা সম্পূর্ণভাবে উপনিষদের দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত, যা ভারতীয় সংস্কৃতির ভিত্তি।

জার্মানিতে কান্টের মাধ্যমে যে মানবতাবোধের জন্ম হলো তা ইউরোপের দেশগুলোতে ছড়ালেও রিলিজিয়ন আর ঔপনিবেশিকতার প্রভাবে সেই মানবতাবোধ থেকে উপনিবেশের মানুষ বঞ্চিত থেকেছে। ইউরোপ, আরব ও এশিয়ার অন্যান্য দেশ-সহ বাকি বিশ্বের শুধুমাত্র আপন রাষ্ট্রীয় স্বার্থে অন্ধ হয়ে ভোগের পথে যাত্রার অভিমুখ পরিবর্তন করানোর জন্যই সভ্যতার দেবী ভারতবর্ষের স্বার্থত্যাগের দর্শনকে সুরক্ষিত রাখা এবং বিশ্বমঞ্চে বারবার ধ্বনিত করার জন্যই উত্তরে হিমালয় ও দক্ষিণে সমুদ্রে পরিবেষ্টিত এই তপোভূমিকে বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতা হিসেবে শাশ্বত জীবন দিয়েছে। 'কারাকাহিনি'তে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধেয় অরবিন্দ উত্তরপাড়া অভিভাষণে এই কথাটিই বলেছেন— '...হিমালয় ও সমুদ্রের যারা পরিবেষ্টিত এই উপদ্বীপে নিরালায় এই ধর্ম গড়ে উঠেছে, এই পুণ্য ও প্রাচীন ভূমিতে আর্যজাতির উপর ভার দেওয়া হয়েছিল এই ধর্মকে যুগ যুগান্তরের ভিতর দিয়ে রক্ষা করতে।

এইটিই হচ্ছে একমাত্র ধর্ম যা মানবজাতিকে ভালো করে বুঝিয়ে দেয়, ভগবান আমাদের কত নিকট, কত আপনার, মানুষ যতরকম সাধনার দ্বারা ভগবানের দিকে অগ্রসর হতে পারে সবই এর অন্তর্গত।' সনাতন ধর্মকে অরবিন্দ ভারতবর্ষের জাতীয়তা বলেছেন। তারও আগে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বন্দে মাতরম্ সংগীতের মাধ্যমে সনাতন ধর্মের মাতৃরূপকে রাষ্ট্রের সঙ্গে এক করে দেখিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ নিজে ১৮৯৬ সালে কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে

মাতরম্ আবৃত্তি করেন। তিনি ১৮৯৬ সালেই রচনা করেন 'অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা' গান। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রাক্কালে স্বদেশ পর্যায়ের প্রত্যেক গানে দেশবাসীকে দেশমাতার নামে এক হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। তাই, রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে ভারতবর্ষের জাতীয় ঐক্যের প্রাণকেন্দ্র ধর্ম ও সনাতন ধর্ম এবং ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয়তা অভিন্ন। ভারতবর্ষের জাতীয়তাবোধ ও রাষ্ট্রবোধ রবীন্দ্রনাথের চেতনায় সমার্থক যার সঙ্গে ইউরোপীয় ন্যাশনালিজমের কোনো মিল নেই। ভারতবর্ষের ঐক্যকে রাষ্ট্রবোধ বা জাতীয়তাবোধ যে নামেই ডাকা হোক না কেন তাঁর মূল ভারতের সনাতন সংস্কৃতিতে। বিপিন চন্দ্র পাল থেকে শুরু করে বীর সাভারকার এই কথাটিকেই বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে উপস্থাপন করেছেন।

স্টেট রিলিজিয়ানের বলে সমগ্র ইউরোপ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন বা ন্যাটোর নামে নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে এক হয়েছে বটে কিন্তু বর্তমানে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে আমরা দেখতে পাচ্ছি, আমেরিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ একদিকে ইউক্রেনকে নিজেদের দলে টানতে অস্ত্র সাহায্য করছে আর অন্যদিকে নিজেদের জ্বালানির চাহিদা মেটাতে রাশিয়ার থেকে তেল ও গ্যাস কিনছে।

দুই স্বার্থের মাঝে দাঁড়িয়ে ইউরোপ শ্বাসরুদ্ধ হচ্ছে। যে রিলিজিয়ানকে ছড়িয়ে দিতে ইউরোপ জোটবদ্ধ হয়েছিল এখন তা দিয়ে বিশ্বভ্রাতৃত্বের কথা শোনাতে পারছে না। আরব দুনিয়াতেও আমরা দেখতে পাই আব্রাহামিক রিলিজিয়নের অন্যরূপ ইসলামের নামে যে দেশগুলি গঠিত হয়েছে তাদের ভ্রাতৃত্বের বাণী ইসলামিক দেশগুলির আপন উচ্চাকাঙ্ক্ষার উর্ধ্বে উঠতে পারেনি। ইসলামিক দেশগুলির অর্গানাইজেনশনের মাধ্যমে জ্বালানি তেলের মাধ্যমে বিশ্ব-অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ রাখতে তুর্কি, সৌদি আরব, ইরান এক হলেও এদের মধ্যেও ইসলামিক দুনিয়ার নেতৃত্ব দেওয়ার প্রশ্নে বিবাদ নতুন নয়।

এই আরব দুনিয়া হোক বা ইউরোপীয় নেশন বা ন্যাশনালিজমের যে সূত্র দেশে দেখা যায় তা শুধু নিজের স্বার্থের জন্যই কখনো বিশ্বশান্তির পথ প্রশস্ত করেনি। পাকিস্তানে, সিরিয়ায়, ইরাকে আপন উপাসনা পদ্ধতির মধ্যেই বিভিন্ন শাখার দ্বন্দ্বে বিশ্বের ইতিহাস রক্তাক্ত হচ্ছে। তাই স্টেটের আইনের মাধ্যমে যে সাম্য, যে ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা হয় তা যেন রিলিজিয়নের মাটিতে উপর থেকে পুঁতে দেওয়া চারা গাছ, যার ফলের ভাগ সারা বিশ্বের জন্য নয়, সেই গাছ সারাবিশ্বের আকাশের জন্য প্রাণবায়ু সৃষ্টি করে না। অন্যদিকে ভারতবর্ষের ধর্মাশ্রিত রাষ্ট্রবোধ ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ, রাজ্য, দেশকে আপন স্বার্থ ত্যাগের সোপান হিসেবে দেখেছে। রবীন্দ্রনাথ এই রাষ্ট্রবোধেরই জীবনভর পূজা করেছেন নিজের কবিতা, গান, প্রবন্ধ ও বক্তৃতার মাধ্যমে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯৩০ সালে তৎকালীন সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ করে তার বৈভব দেখে চমকিত হয়েছিলেন কিন্তু সেই বৈভবের প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়ার আপন দেশবাসীর লক্ষ লক্ষ মৃতদেহের উপর। ১৯৩০ থেকে ১৯৩৩ সালের মধ্যে কাজাখের দুর্ভিক্ষে প্রায় ১ লক্ষ মানুষ মারা যায়, ইউক্রেনের হলডোমোর গণহত্যায় প্রায় ৩ লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলা হয় সোভিয়েত রাশিয়ায়। এরপরেও সোভিয়েত রাশিয়ার NKVD স্টালিনের নেতৃত্বে যে গণহত্যা (Great Purge) চালিয়েছিল তা সোভিয়েত রাশিয়ার লৌহ যবনিকা ভেদ করে রবীন্দ্রনাথের চোখ-কান পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি; পৌঁছালে ১৯৪১ সালে তিনি নিজের শেষ প্রবন্ধ 'সভ্যতার সংকট'-এ সোভিয়েতের নিজের দেশবাসীর উপর এই অত্যাচারের কথা নিশ্চয়ই লিখতেন। কিন্তু এই অধর্মের পতন হতে আরও অর্ধশতাব্দী পার হয়েছিল।

বর্তমান ভারতে আমরা যে রাষ্ট্রবোধের উত্থান দেখছি তা ভারতবর্ষকে ভিতর থেকে শক্তিশালী করছে আপন স্বার্থের জন্য নয়, বিশ্বকল্যাণের জন্য। করোনা মহামারির ভ্যাকসিনের জোগান দেওয়া, ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত ভারতবিরোধী তুর্কিকে 'অপারেশন দোস্ত'-এ সাহায্য করা সবেতেই প্রমাণিত হয়েছে ভারতের রাষ্ট্রবোধ ভোগের জন্য নয়, ভাগীদারির জন্য। একমাত্র উপনিষদ শুনিয়েছে 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। রাষ্ট্রবোধসম্পন্ন ভারতবর্ষ যখন নেতৃত্ব পেল জি-২০ সম্মেলনের, বিশ্বকে স্বার্থ ত্যাগ করে বিশ্বশান্তির এই মহামন্ত্রই শুনিয়েছে— যে মন্ত্র কয়েক হাজার বছরের বৈদেশিক আক্রমণের পরেও ভারতবর্ষ নিজের বক্ষপিঞ্জরে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে। সেই বক্ষপিঞ্জরের নামই রাষ্ট্রবোধ। ভারতবর্ষের অতীতের গৌরবময় স্মৃতি আর বৈদেশিক আক্রমণে শত দুঃখ সহ্য করেও এই রাষ্ট্রীয়তাকে বাঁচিয়ে রাখার আনন্দকেই বিশ্বকবি আত্মশক্তি বলে চিহ্নিত করেছেন 'নেশন কী' প্রবন্ধে। নিজের জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার মধ্যে কবি যখন সভ্যতার সংকট নিয়ে ভাবছেন, ভারতবর্ষের দিকে তাকিয়ে তাঁর আশা 'আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাঞ্চলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে'। কবিগুরুর ভবিষ্যদ্‌বাণী সত্যি হতে দেখে বলতে ইচ্ছে হয়— 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে। সার্থক জনম, মা গো তোমায় ভালোবেসে।।'

রবীন্দ্র-রামেন্দ্র জুটি সাহিত্যের মাধ্যমে জাতির জাগরণের কাজটি করেছিলেন

দীপক খাঁ

রবীন্দ্রনাথ বয়েসে তিন বছর তিন মাসের বড়ো রামেন্দ্র সুন্দরের চেয়ে। কিন্তু বাস্তবে তাঁরা ছিলেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। নাম 'প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের মূলমন্ত্র'। 'প্রকৃতি' গ্রন্থের লেখক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। তখন তিনি রিপন কলেজে পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের অধ্যাপক এবং মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধ লেখক। নবজীবন, সাধনা, ভারতী প্রভৃতিতে প্রবন্ধ রচনার সূত্রে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয়। ১৮৯৪ সালের ২৯ এপ্রিল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের প্রথম সভায় সভাপতি ও সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন যথাক্রমে রমেশচন্দ্র দত্ত ও নবীনচন্দ্র সেন। দু' মাস পরেই পরবর্তী অধিবেশনে অন্যতম সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন রবীন্দ্রনাথ। প্রশান্তকুমার পাল লিখেছেন, বস্তুত সহ-সভাপতি নির্বাচিত হবার পরই তাঁর সঙ্গে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের যোগসূত্র স্থাপিত হয়, এই সম্পর্ক সারাজীবন রক্ষা করেছিলেন। সভ্য হবার চার মাসের মধ্যেই রামেন্দ্রসুন্দর সাহিত্য পরিষদের অন্যতম সম্পাদক নির্বাচিত হন। এই পরিবেশে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের ভাববিনিময় ও গুণগ্রাহিতা গাঢ় হয়। নানাভাবে তাঁরা স্বদেশমাতৃকার উন্নতির ও পরিষদের বিকাশ প্রসঙ্গে মত বিনিময় করেন।

সমাজ ও ধর্মবিষয়ে মতপার্থক্য তাঁদের ছিল কিন্তু তাসত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে অন্তরের গভীর একটি যোগ ছিল। 'কবির মুখে ত্রিবেদীর সম্বন্ধে বহুবার বহুকথা শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কখনো বিরূপ সমালোচনা করিতে শুনি নাই'— লিখেছিলেন রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বঙ্গদর্শনে রামেন্দ্রসুন্দরের বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তবে তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর অন্তরের সাযুজ্য ঘটেছিল বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। এই আবেগপূর্ণ দিনগুলোতে রবীন্দ্রনাথের 'রাখিবন্ধন' এবং 'বাঙ্গলার মাটি বাঙ্গলার জল' গান রচনার কথা কে না জানে। ১৩১২ বঙ্গাব্দের ৩০ আশ্বিন কলকাতার রাজপথে চলছিল রাখিবন্ধন উৎসব, অন্যদিকে ওই দিনই সারা বাঙ্গলা জুড়ে চলছিল অরন্ধন ব্রত, যার প্রস্তাবক ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর। আর এই উপলক্ষ্যে তিনি রচনা করেছিলেন 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা'। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে দুই মনীষীর একাত্মতা লক্ষণীয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সহ-সভাপতি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিষদ সম্পর্কে আলোচনা করতে রামেন্দ্রসুন্দর প্রায়ই জোড়াসাঁকোতে যেতেন। সেখানেই নানা আলোচনার মাধ্যমে একদিন স্থির হয় দেশের মানুষকে একসূত্রে গ্রথিত করবার উদ্দেশ্যে দেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে 'বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন' করা দরকার। এর পটভূমি রচনা করেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। তিনি বলেছিলেন, 'সারা বাংলাদেশ জুড়ে, সমস্ত বাঙ্গালি জাতিকে যথাসম্ভব জাগিয়ে তোলা পরিষদের সাম্প্রতিক মুখ্য কর্তব্য। আপাতত পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন কলকাতায় না করে বাঙ্গলার ভিন্ন ভিন্ন নগরে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত হলে কাজটা শুরু হতে পারে।'

এই কথার সূত্র ধরেই রামেন্দ্রসুন্দরের উদ্যোগে কাশিমবাজারের মহারাজা মণীন্দ্রনাথ নন্দীর আহ্বানে রবীন্দ্রনাথের সভাপতিত্বে ১৭ ও ১৮ কার্তিক কাশিমবাজারে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের প্রবন্ধটি পাঠ করেন। উভয়ের সখ্য ও শ্রদ্ধা নিদর্শনের সর্বোচ্চ প্রকাশ ঘটে ১৩১৮ বঙ্গাব্দে রবীন্দ্রনাথের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে টাউন হলে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁর প্রথম সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে। বাংলা সাহিত্যসেবীদের একাংশ রীতিমতো রবীন্দ্রবিরোধী ছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথ তখনও নোবেল পুরস্কার পাননি। রবীন্দ্রবিরোধীদের নিন্দা-বিদ্রূপ অগ্রাহ্য করে পরিষদ সম্পাদক রামেন্দ্রসুন্দরই এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করার উদ্যোগ নেন। ১৮ জানুয়ারি ১৯১২ সালে টাউন হলে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। যে উৎসব কমিটি গঠিত হয় তাঁর অভ্যর্থনা সমিতিতে ছিলেন জগদীশচন্দ্র বসু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, রামেন্দ্রসুন্দর, সারদাবেন মিত্র, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, আশুতোষ চৌধুরী, ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী ও মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী। সভাপতি ছিলেন সাহিত্য পরিষদের তৎকালীন সভাপতি বিচারপতি সারদাচরণ মিত্র। রামেন্দ্রসুন্দর স্বরচিত অভিনন্দন পত্রটি কবির হাতে তুলে দেন। কবি এই অভিনন্দনের উত্তরে বলেন, 'আমি নিশ্চয় জানি আজ আপনারা যে সম্মান দান করলেন, সে সম্মান অপনারা বঙ্গসাহিত্যকেই দিলেন, আমি তার উপলক্ষ্য মাত্র। আপনাদের এই মাল্যচন্দন, এই অর্ঘ্যপাত্র আমি নতশিরে বহন করিয়া বঙ্গবাসীর মন্দিরে তাহা নিবেদন করিয়া দিব।'

ওই অভিনন্দন সভার পরে পরেই পরিষদের

অধীনের ছাত্রসভ্যগণ কর্তৃক ১৯ মাঘ ১৩১৮ সালে সন্ধ্যায় পরিষদ মন্দিরে আরও একটি স্বতন্ত্র সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। টাউন হলে রবীন্দ্রসংবর্ধনার বিবরণ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার পরেও সাহিত্য পরিষদের পক্ষে এই অনুষ্ঠান করার জন্য পদ্মনাথ ভট্টাচার্য নামে এক ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের সমালোচনা করে তাঁকেই এক পত্র লেখেন। উত্তরে রামেন্দ্রসুন্দর দ্বিতীয় অনুষ্ঠানকে সমর্থন করে পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকে যে চিঠি লেখেন তার কিছুটা এরকম :

'রবীন্দ্রবাবু বহু বৎসর সাহিত্যের উপকার করিয়াছেন, সেই উপকারের পরিমাণও সামান্য নহে, এ বিষয়ে দ্বিমত নাই; কাজেই একটা উপলক্ষ্য পাইয়া তাঁহার প্রতি কিঞ্চিৎ সম্মান প্রদর্শন করায় পরিষদের কোনোরূপ অপরাধ হইয়াছে বলা উচিত নহে। অতএব রবীন্দ্রনাথের প্রতি সবিশেষ পক্ষপাত করিয়া সাহিত্য পরিষদ একটা অন্যায় কাজ করিয়াছেন, তাহা বলা চলে না।'

এই সংবর্ধনার কিছুদিন পর কবি নোবেল পুরস্কার পেলে সারা বাঙ্গলায় অলোড়ন ওঠে। রামেন্দ্রসুন্দর তখন (১৩২০ বঙ্গাব্দের ৫ অগ্রহায়ণ) পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকে লেখেন, 'রবীন্দ্রবাবুকে যদি সে সময় সংবর্ধনা না করা হইত এবং আজি বিলাতের সার্টিফিকেট দেখিয়া আমরাও দেখাইতে উপস্থিত না হইতাম, তাহা হইলে লোকে বলিত না কি যে, আমরা স্বদেশি হইয়াও দেশের এত বড়ো লোকটাকে আদর করিলাম না বা চিনিলাম না; আর আজ সাহেবি সার্টিফিকেট দেখিবামাত্র অমনি জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলাম। তাহা হইলে বাঙ্গলাদেশের মুখখানা কতটুকু হইত?'

অন্য এক পত্রে রবীন্দ্রসংযোগ না থাকলেও পদ্মনাথ ভট্টাচার্যকে লিখেছিলেন, 'অন্যান্য সাহিত্য সেবক ও সাহিত্য অনুগ্রাহকদেরকেও পরিষদ এইরূপে যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শনে চিরকাল প্রস্তুত আছেন ও থাকিবেন। তাহার নজির আছে। বহুদিন আগে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা প্রাপ্তির উপলক্ষ্যে তাঁহার সম্মানার্থে বিশেষ উৎসব হইয়াছিল। পরিষদের সভাপতি সারদাচরণ মিত্র হাইকোর্টের বিচারপতির পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিলে তাঁহাকে অভিনন্দন দেওয়া হইয়াছিল। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির জীবদ্দশায় পরিষদ তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাইবার অবসর পায় নাই; কেননা বিদ্যাসাগর ও বঙ্কিমচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের অস্তিত্ব ছিল না এবং হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্রের জীবদ্দশায় পরিষদের তাদৃশ সামর্থ্য ছিল না। বিদ্যাসাগরের বহু যত্নের লাইব্রেরিটি যখন নিলামে চড়িয়া বাঙ্গালির দুই গালে চুনকালি মাখাইবার উপক্রম করিয়াছিল, পরিষদ তখন মাঝে পড়িয়া ওই লাইব্রেরিটি রক্ষা করিয়াছেন ও উহা পরিষদ মন্দিরে সযত্নে রক্ষিত হইয়া বিদ্যাসাগরের জীবন্তমূর্তি স্বরূপ সাধারণের সম্মুখে রহিয়াছে।' উদ্ধৃত পত্রের শেষ বাক্যটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ— যখন মহাজনেরা নিলামের জন্য বিজ্ঞাপন দেন, সেই বিজ্ঞাপন লালগোলার মহারাজ যোগীন্দ্রনারায়ণের চোখে পড়ে। সেই মহামূল্য সম্পদ যাতে বিনষ্ট না হয় তিনি নিজেই সেই গ্রন্থরাজি কিনে নেন এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে দান করেন। এর নেপথ্য কারিগর ছিলেন রামেন্দ্রসুন্দর; তিনিই উদ্যোগী হয়ে ওই সকল পরিষদে আনাবার ব্যবস্থা করেন।

রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দরের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও অনুরক্তির কথা উল্লেখ করে অধ্যাপক বিপিন বিহারী গুপ্ত লিখেছেন, 'একট নূতন গান রচনা করিয়া রবীন্দ্রনাথের আনন্দ সম্পূর্ণ হইত না যদি তাহা অচিরে রামেন্দ্রসুন্দরকে তিনি না শুনাইতে পারিতেন। আবার রবিবাবুর উত্তেজনায় রামেন্দ্রবাবু যে 'বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রতকথা' রচনা করিয়াছিলেন, তাহা বাংলাভাষায় একটি ক্লাসিক বলিয়া পরিগণিত হইতে পারিত, কিন্তু কেন জানি না, তদানীন্তন কলকাতার পুলিশ কমিশনার রামেন্দ্রবাবুকে পুস্তকটির প্রচার বন্ধ করিবার আদেশ দিলেন। রবিবাবুর সে সময়ের অনেক গানও আর শোনা গেল না। এমনি করিয়া ভালো-মন্দের ভিতর দিয়া; সুখে-দুঃখে আনন্দে-বিষাদে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর বাঙ্গালিকে সত্যের পথে, ঐক্যের পথে লইয়া চলিয়াছিলেন।'

১৮৯৭ সালের ১৯ জুলাই থেকে শুরু করে ১৯১৯ সালের ২৩ জানুয়ারি রামেন্দ্রসুন্দরকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চল্লিশটি পত্র এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা রামেন্দ্রসুন্দরের মাত্র ৮টি পত্র পাওয়া যায়। ভাষার চরিত্র থেকে বোঝা যায় যেন বন্ধুকে লেখা বন্ধুর মতো। ২৭ এপ্রিল ১৯০৫-এর চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'আমাদের স্কুলে দুটিমাত্র বয়ঃপ্রাপ্ত ছাত্র আছে, তাহাদিগকে আপনার নির্দেশমতো পরিষদের কাজে লাগাইয়া দিব। পরিষদের শৈশব বিভাগের ভার সম্পূর্ণ আপনাকে লইতে হইবে। ইহাকে লালফিতার বাঁধনে অকালে প্রাণত্যাগ করিতে দিবেন নাই'।

১৯০৭-এর ২ মে লিখেছেন, 'রংপুর আমার উপর আবার অত্যন্ত উপদ্রব শুরু করিয়াছেন। আমার সন্দেহ হইতেছে আপনারা এই চক্রান্তের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে আছেন। দৈবলক্ষণ কি আপনারা একেবারেই মানেন না? ইংরাজি শিখিয়া কি আপনাদের এই দশা হইল? দোহাই আপনাদের, আমারও আর সভাসমিতি এবং টানটানি সহ্য হয় না। কী উপায় অবলম্বন করিলে নিষ্কৃতি পাইতে পারিব তাহার একটা উপায় বলিয়া দিবেন।'

বোলপুর থেকে লেখা ২ জুলাই ১৯০৭-এর পত্র : 'আপনি একবার দয়া করিয়া এখানে পদার্পণ করিবেন আমাদের সকলেরই এই প্রার্থনা— সে কি একেবারেই সম্ভাব্যের বাহিরে? এখানে আসিলে মফসস্‌ল পরিষদের সম্বন্ধেও আলোচনা হইতে পারিবে।' উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। প্রতিপক্ষে রামেন্দ্রসুন্দরের লেখা চিঠিগুলির কিছু ভাষাও লক্ষণীয়। ৯ মার্চ ১৯০০ সালে 'বৈশাখের পত্রিকার জন্য আর একটি প্রবন্ধের ভিক্ষার্থী হইয়া আপনার দ্বারস্থ হইলাম। আশা করি বঞ্চিত হইব না। আপনি নিরবচ্ছেদে ক্রমাগত ধাক্কা দিতে থাকিলে আমাদের সাহিত্য সমাজের জড়তায় কিঞ্চিৎ চাঞ্চল্য উপস্থিত হইতে পারে আশা করি।' কবির নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পর ১৬ নভেম্বর ১৯১৩-তে রামেন্দ্রসুন্দর লিখেছেন— 'সুহৃদ্‌বরেষু, আজ ইউরোপ আপনার জয়ডঙ্কা বাজাইয়াছে ও অবশেষে সোনার মুকুটের অলঙ্কার পরাইয়াছে, তাই শুনিয়া ও দেখিয়া আপনার নিকট আনন্দ প্রকাশে, লজ্জা ও সংকোচ হইতেছে। সেই আত্মাবমাননায় আমি প্রস্তুত নহি, বিধাতৃ-বিধানে আপনার যাহা প্রাপ্য, আপনি তাহা পাইয়াছেন— উহাতে আপনার স্বোপার্জিত স্বত্ব আছে— উহা কোনোরূপ উপরি পাওনা নহে। আজি আমরা অকুণ্ঠিতভাবে জয়ধ্বনি দিব। আপনার জয় নহে— আপনার 'সোনার বাংলা'র জয়, আপনার ভুবনমনোমোহিনীর জয়। বিধাতার হাতে আপনি যন্ত্রমাত্র, আপনাকে দিয়া বিধাতা এতকালের এই অবমানিত জাতিকে জগতে প্রতিষ্ঠা দিলেন, আজি বিধাতার জয়। সেইজন্য আনন্দ করিব।' ১৩৩০ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাসে আশুতোষ বাজপেয়ী 'রামেন্দ্রসুন্দর জীবনকথা' নামে যে প্রথম জীবনীটি রচনা করেন তার ভূমিকা লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সেই ভূমিকাটিকে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক রামেন্দ্রসুন্দরের মূল্যায়ন হিসেবে গ্রহণ করা চলে। □

বঙ্গ জীবনের অঙ্গে অঙ্গে শ্রীরাম

দশরথ পুত্র শ্রীরামচন্দ্রকে ভগবান বিষ্ণুর সপ্তম অবতার বলা হয়। সাম্প্রতিককালে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে সর্বোচ্চ আদালতের অনুমতি সাপেক্ষে রামমন্দির নির্মাণকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে তৃণমূল সুপ্রিমো থেকে অতি বামপন্থী বুদ্ধিজীবীরা প্রকাশ্যে সমালোচনা করে বলেছেন, বঙ্গ সমাজজীবনে ভগবান রামের কোনো প্রভাব কখনোই ছিল না। সোজা বাঙ্গলায় রাম বাঙ্গালির আরাধ্য দেবতা নন। এটা মূলত হিন্দি বলয় থেকে রাজনৈতিক কারণে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবহার করছে বিজেপি। অথচ বাঙ্গলার ইতিহাস বলছে, বাঙ্গলার শ্রেষ্ঠ উৎসব হলো দুর্গাপূজা, যা ছিল রামচন্দ্রের শরৎকালে করা অকালবোধন। আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর শুরুতে পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার অন্তর্গত ফুলিয়া গ্রামের কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায় (ওঝা) ছিলেন মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের একজন প্রধান কবি।

আনুমানিক ১৪০৩ খ্রিস্টাব্দে বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত রামায়ণের সহজবোধ্য বাংলা পদ্যানুবাদ করেছিলেন তিনি। বাঙ্গালির আবেগ, অনুভূতি ও রুচির দিকে লক্ষ্য রেখে সর্বজনবোধ্য পদ্যে মূল সংস্কৃত রামায়ণের ভাবানুবাদ করায় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ব্যাপক জনপ্রিয়তা পেয়েছে বাঙ্গলায়, যা আজও অক্ষুণ্ণ। বাঙ্গলার সামাজিক রীতিনীতি ও লৌকিক জীবনের নানা অনুষঙ্গের প্রবেশ ঘটিয়ে তিনি সংস্কৃত রামায়ণ উপাখ্যানের বঙ্গীয়করণ করেন। কৃত্তিবাস অনুদিত রামায়ণ কৃত্তিবাসী রামায়ণ নামে পরিচিত। আবার পঞ্চদশ শতাব্দীর বাঙ্গালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক চৈতন্য মহাপ্রভু ছিলেন ভাগবত পুরাণ ও ভাগবদগীতায় উল্লিখিত দর্শনের ভিত্তিতে সৃষ্ট বৈষ্ণব ভক্তিযোগ মতবাদের প্রবক্তা। গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণাবতার মনে করেন। তাঁর সময়কালে ভগবান রামচন্দ্রের পুজোর নজির পাওয়া যায় তৎকালীন বাঙ্গলায়, কালনার গৌরী দাস পণ্ডিতের শ্রীপাটে, শান্তিপুরের বড় গোস্বামী ও মধ্যম গোস্বামীর সুত্রাগড় অঞ্চলের বাড়িতে, হাওড়া জেলার রামরাজাতলায়, পাঁশকুড়ার রাজবাড়িতে ও শ্রীরামপুরে। মহাপ্রভুর নিজের রামভক্তি পরায়ণতার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর সমস্ত লীলাকাল জুড়ে। যেমন দক্ষিণাপথে চলার সময় মহাপ্রভু দ্বারা যে সংকীর্তন শোনা গেছিল তা হলো 'কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব কৃষ্ণ কেশব পাহি মাম, রাম রাঘব রাম রাঘব রাম রাঘব রক্ষ মাম'।

বাঙ্গলার বিভিন্ন অঞ্চলে ভগবান শ্রীরামের পূজা অনেক আগে থেকে হয়ে এসেছে। পশ্চিমবঙ্গের কাটোয়া মহকুমায় প্রায় কুড়িটির মতো রামের মূর্তি আছে। এছাড়া বাঁকুড়া জেলাতেও রামমন্দির পাওয়া যায়। বাঙ্গলায় রঘুনাথশিলা রূপে পুজো করা হতো শ্রীরামচন্দ্রের। রাঢ়বাঙ্গলায় শ্রীরামকে নিয়ে অনেক মুদ্রা পাওয়া গেছে। কাজী নজরুল ইসলাম তাঁকে নিয়ে অনেক গান লিখেছেন। রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, রানি রাসমণি, মুরারী গুপ্ত, চৈতন্য জীবনী লেখক দয়ানন্দ-সহ অনেকেই শ্রীরামের পূজা করতেন বাঙ্গলায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবমত জনপ্রিয় হওয়ার আগে অনেকেই রাম মন্ত্রে দীক্ষা নিতেন। রানি রাসমণি রঘুবীরের রথযাত্রা করতেন। এছাড়াও বাঙ্গলার প্রতি জনপদে প্রতিটি অঞ্চলে রাম ও লক্ষ্মণ নামের প্রচলন আজও বিদ্যমান। আজও বাঙ্গালির ভ্রম সংশোধনের ক্ষেত্রে 'এ রাম' শব্দটি সর্বজনবিদিত। বাঙ্গলার সাধারণ মানুষ আজও প্রতিপক্ষের দিকে মোক্ষম চাল দেওয়াকে 'রাম-বাণ' বলেই অভিহিত করেন। আপামর বাঙ্গালির অন্ধকারাচ্ছন্ন ভয়ার্ত মুহূর্তে 'রাম' নামেই আস্থা আজও। এছাড়াও বাঙ্গলার শহর থেকে গ্রামে বহু অঞ্চলের নামের সঙ্গে জড়িয়ে আছেন রাম। যেমন রামরাজাতলা, রামপুর, রাম বাগান, শ্রীরামপুর আরও অনেক। আর ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালির নিত্য উপাসনা হরিনাম সংকীর্তনে 'হরে কৃষ্ণ, হরে রাম'-এর মাধ্যমে বঙ্গসমাজ জীবনের অঙ্গে অঙ্গে পুরুষোত্তম শ্রীরাম আরাধ্যা রূপে প্রতিষ্ঠিত।

পৃথ্বীশ দাশগুপ্ত,
নয়া দিল্লি।

এই রাজ্যে অপরাধীর ধর্ম দেখে শাস্তির ব্যবস্থা হয়

কালিয়াচক থেকে কালিয়াগঞ্জ দুটি থানা পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত, যার পুলিশমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী একই ব্যক্তি। ঘটনা প্রায় একই দুটি থানা জনতার দ্বারা আক্রান্ত। তফাৎ শুধু এক স্থানে অবৈধ আফিম চাষি ও গাঁজা তস্কররা এনআইএ-র ভয়ে থানার রেকর্ড রুমে আগুন দিয়েছে, সঙ্গে থানার ঘর গাড়িতেও। শেষে পুলিশ কোয়ার্টারে মহিলাদের টানাটানি। পুলিশ থানা ছেড়ে পলায়ন। দ্বিতীয় স্থানে জিহাদিদের হাতে হিন্দু রাজবংশী মেয়ের ধর্ষণ ও হত্যার বিরুদ্ধে জনতার রোষ, তার উপর পুলিশের জিহাদিদের বাঁচানোর চেষ্টা। কালিয়াচকে আক্রমণকারী মুসলমান। ফলে তাদের বাঁচানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রীর কত সাফাই। আর কালিয়াগঞ্জে পুলিশের অমানবিক আচরণ, নবান্ন, এসপি এক সুরে জিহাদিদের মনোবল বৃদ্ধির জন্য মৃত মেয়েটিকে কুকুরের মতো টেনে হিচড়ে নিয়ে যাওয়া। হিন্দুদের উপর লাঠিচার্জ। গ্রেপ্তার। তার বিরুদ্ধে তপশিলী জাতির জনতা থানায় গেলে পুলিশের অমানবিক আচরণে ও প্ররোচনায় হাঙ্গামা হয়। এখন মুখ্যমন্ত্রী যোগীর পথ মেনে বলছেন, হাঙ্গামাকারীদের শাস্তি হবে, দরকারে

তাদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হবে। হায়, মুখ্যমন্ত্রী! সিএএ-র প্রতিবাদে যখন দুধের গাইগুলো রেল স্টেশন, সরকারি সম্পত্তি লুঠপাট করে অগ্নিসংযোগ করল, তাদের কোনো শাস্তি হলো না। সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার কথা মুখেও আনলেন না। তার মানে অপরাধীর ধর্ম দেখে শাস্তির ব্যবস্থা। সাবাস!

গৌতম কুমার সরকার
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

প্রসঙ্গ নারী দিবস

সম্প্রতি বিশ্ব নারী দিবস সাড়ম্বরে পালিত হয়ে গেল। মানব সভ্যতার প্রগতিশীল বিশ্বে অগ্রগতি প্রণিধানযোগ্য। এই প্রগতিশীল বিশ্বে মানব সৃষ্টি বৃদ্ধির মূলে আছে নারীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ও অন্তর্নিহিত মিলন মাধুর্য। কী জীব, কী উদ্ভিদ, কী প্রাণী— সকলেই নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য মেতে উঠেছে সৃষ্টির খেলায়।

জীব শ্রেষ্ঠ মানুষ উন্নত বুদ্ধিমত্তার দ্বারা স্বপ্রতিভ প্রতিভায় প্রতিভাত হয়ে নিজেদের প্রয়োজনে প্রকৃতিকে সাজিয়ে তুলেছে তার বিশেষ জ্ঞান দ্বারা এক বিস্ময়কর রূপ সৌন্দর্য ও সম্পদে পরিপূর্ণ পৃথিবী, জল-স্থল- আকাশ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল সম্পদ সৃষ্টি ও আবিষ্কারের ক্ষেত্রে আজকের পৃথিবীতে নারী-পুরুষ প্রতি পদক্ষেপ সমানতালে তাল মিলিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। অনুপুঙ্খ দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারী রয়েছে এগিয়ে। যেমন মৃতশিল্পে, চাশিল্পে, বস্ত্রশিল্পে। আজকের নারী জলে-স্থলে-আকাশে সবক্ষেত্রে তার বিজয়াভিযান চালাচ্ছে, সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্প, নাটক, নৃত্যগীতি, দেশরক্ষা— সর্বক্ষেত্রে দক্ষতার পরিচয় রাখছে।

সনাতন সভ্যতায় নারী জগতজননী। স্বামী বিবেকানন্দ কুমারী পূজা করে তার দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন। পুরাণের সৃষ্টিতত্ত্বে শ্রীহরির বুদ্ধি থেকে দেবী দুর্গার সৃষ্টি, শ্রীহরির মন থেকে সৃষ্টি লক্ষ্মীদেবীর, তাই তার আর এক নাম মা কমলা। শ্রীহরির মুখ থেকে সৃষ্টি সরস্বতীর, তাই তার আর এক নাম বাক্‌দেবী। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির পিছনে ক্রিয়াশীল জীবন দেবতার অস্তিত্বকে অনুভব করেছেন। আর সেই ক্রিয়াশীল দেবতা ছিলেন হয়তো কোনো নারীশক্তি। তাই তার চিত্রা, চৈতালি, পূরবী ইত্যাদি কাব্যগুলির নাম স্ত্রীবাচক। মাইকেল মধুসূদনের বীরাঙ্গনা, ব্রজাঙ্গনা ইত্যাদি কাব্যগুলি একই ধরনের মানসিকতারই পরিচয় বহন করে।

কবি নজরুল ইসলাম 'নারী' কবিতায় লিখেছেন, আমার চখে পুরুষ নারীর কোনো ভেদাভেদ নাই। বিশ্বে যা কিছু মহান সৃষ্টি চিরকল্যাণকর অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।'

আবার শ্যামাসঙ্গীত লিখে ও গেয়ে নারীশক্তিকে শ্রদ্ধা ও সম্মান জানিয়েছেন। বর্তমানে আমাদের দেশে শিশুকন্যা, যুবতী ও বৃদ্ধাদের যে অসহনীয় চিত্র ফুটে উঠেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক। ধর্ষণ, হত্যা অতি বেদনার।

প্রবাহমান কাল ও প্রগতির পাখা মেলে পাশ্চাত্যে নারী সভ্যতায় বিংশ শতকের ষাটের দশকের শেষের দিকে আমেরিকায় সংগঠিত হয় সাড়া জাগানো নারী আন্দোলন। এ ছিল এক চরমপন্থী নারী আন্দোলন। এই আন্দোলনে বিশ্ব নারীসমাজ পুরুষের দাসত্ব থেকে মুক্তি চাইল। স্বেচ্ছা গর্ভপাত আইন চাইল। পরে নারী ও পুরুষের সমন্বয় সাধনে বিশেষ প্রচেষ্টায় আন্দোলন স্থিমিত হয়।

বহু দেশ ভ্রমণের পর বিশ্বকবি বলেছিলেন, 'পৌরাণিক সমাজ ব্যবস্থায় বহু বিবাহের প্রচলন ছিল। বহু প্রচেষ্টায় ঋষি উদ্যালক ও পুত্র শ্বেতকেতু বহু বিবাহ নিবারণ করেন। সনাতন ধর্মে কুসংস্কার নিবারণে রাজা রামমোহন ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, সতীদাহ নিবারণ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনে আইনের আশ্রয়ে এক ঐতিহাসিক মহান ঐতিহ্য স্থাপন করে গেছেন।

সেই সঙ্গে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আইনের আশ্রয়ে তিন তালাক নিবারণ ঐতিহাসিক কর্ম সাধন। প্রাচীন ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য নারী শিক্ষা, বুদ্ধিমত্তা ও পাণ্ডিত্যে মৈত্রেয়ী, গার্গী, বাচক্লবী। স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রীতিলতা, বিপ্লববাদের জননী সরলাদেবী, মাতঙ্গিনী প্রমুখ মহিলাদের আত্মবলিদান ইতিহাসের পাতা স্বর্ণাক্ষরে ধরে রেখেছে।

রবীন্দ্রনাথ রায়
রাশিডাঙ্গা-২, কোচবিহার

সুলতান মাহমুদের পৈশাচিক অত্যাচার

এক হাজার বছর আগে সোমনাথ মন্দিরে গজনির সুলতান মাহমুদ আঘাত হানে। হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে নৃশংসভাবে হত্যা করে। পাকিস্তানপন্থী ভারতীয় ঐতিহাসিকদের ধারণা, সোনার খনি উদ্ধারের জন্য এসব। তবে প্রাণরক্ষায় আশ্রয় নেওয়া হাজার হাজার নিরপরাধ মানুষকে নৃশংসভাবে খুন করা কেন? কেনই বা বিগ্রহের স্থান গজনির মসজিদের সিঁড়ির নীচে হয়? আলবেরুনির ভারত গ্রন্থে কী পাওয়া যায়?

১৮০ নম্বর পৃষ্ঠায় দেখা যায়, ৮১৬ হিজরি (খ্রিস্টাব্দ ১০২৪) যুবরাজ মহমুদ সোমনাথ বিগ্রহ ধ্বংস করেন। তার নির্দেশে বিগ্রহের স্বর্ণালঙ্কার, ধনরত্ন সমেত নিম্নাংশ গজনিতে তার প্রাসাদে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। থানেশ্বর থেকে আনা চন্দ্রস্বামীর তাম্রমূর্তির সঙ্গে সোমনাথ বিগ্রহের কিছু অংশ গজনির মসজিদের দরজার বাইরে রাখা আছে, যাতে মসজিদে প্রবেশ করার আগে লোকেরা পা ঘষে পায়ের ময়লা পরিষ্কার করে।

আলবেরুনির দেওয়া সোমনাথ মন্দির আক্রমণের বিবরণ তথাকথিত খ্যাতিমান ভারতীয় ইতিহাসবিদদের কাছ থেকে পাওয়া গেল না। তারা আজও পাকিস্তানপন্থী রয়ে গেছে বলে মনে হয়।

রাধাকান্ত ঘোড়াই
ডাবুয়াপুকুর, পূব মেদিনীপুর

সম্মানের বদলে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য!

আঁখি মহাদানী মিশ্র

একবিংশ শতাব্দীর দুই দশক পরে আজ আমরা নারীরা স্বাধীনতার শীর্ষে। কখনও জয় করছি এভারেস্ট, কখনও করছি রাজ্যশাসন, দেশশাসন, কখনও আবার রাষ্ট্রপ্রধানের ভূমিকায়। কখনও আকাশের বুক চিরে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছি বিমান, গড়ে তুলছি মহিলা পুলিশ স্টেশন। সর্বক্ষেত্রেই নারীর জয়জয়কার। তাহলে আমাদের অবস্থান পালটেছে! আজ আমরা অবাধে নির্ভয়ে যে কোনও কাজে এগিয়ে যেতে পারি, তাই না? সত্যিই কি তাই? বাস্তব মনে হয় ভিন্ন। গ্রামের নির্জন দুপুরে বা সন্ধ্যায় রাস্তায় আমরা বাড়ির ছোট ছোট মেয়েদের পাঠাতে বা নিজেরাও যেতে ভয় পাই। শুধু কি গ্রামের? শহরের কোলাহলপূর্ণ রাস্তা, বাস-ট্রাম-ট্রেনও নিরাপদ নয়।

একদিকে যেমন মেয়েদের শিক্ষাদীক্ষার অধিকার বাড়ছে, অন্যদিকে তেমনই কিছু পুরুষের অত্যাচার ও বর্বরতাও গিয়ে ঠেকেছে সেই অন্ধকার যুগে। মেয়েরা স্বাধীন হয়েও নিরাপত্তার অভাবে আজও পরাধীন। দিল্লী, কামদুনি, কৈজুড়ি, কালিয়াগঞ্জের মতো ঘটনা এখন নিত্যদিন ঘটে চলেছে। সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় তার আক্ছার উপস্থিতি যেন সংবাদপত্রের মহিমাকে কলঙ্কিত করছে প্রতি মুহূর্তে। আর তার উপর সোনায় সোহাগা রাজনৈতিক নেতাদের আচরণ। 'মেয়েরা মেয়েদের শত্রু'— এই প্রবাদকে সত্যি করেছেন রাজ্যের মহিলা মুখ্যমন্ত্রী। আমাদের আশা ভরসা থাকে যখন কোনও মহিলা ক্ষমতার শীর্ষে অধিষ্ঠান করেন, মনে হয় এবার হয়তো মেয়েদের অপমান ও দুঃখ ঘুচবে। কিন্তু আশাভঙ্গ হয় যখন তিনি নিজেকে মহিলা হিসাবে নয় ক্ষমতালোভী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

মেয়েদের সম্মানের পরিবর্তে ভাইয়ের পড়াশুনা, দাদার চাকরি, বাবা-মায়ের

চিকিৎসা— এটাই কি কাম্য? তবে কি মেয়েরা তাদের সম্মানের বদলে এনে দেবে পরিবারের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য? এ কোন বর্বরযুগে বাস করছি আমরা? একদিকে মেয়েদের স্বাধীনতা ও সম্মানের বড়ো বড়ো বুলি আওড়াচ্ছি, আর অন্যদিকে প্রতিনিয়ত পদদলিত করছি তাদের সম্মান।

আজ সত্যিই মেয়েদের রুখে দাঁড়াবার সময় এসেছে। প্রতিটি মেয়েকে কেড়ে নিতে হবে তাদের সুস্থভাবে বাঁচার অধিকারকে। আত্মরক্ষার জন্য পুরুষের উপর নির্ভরশীল না হয়ে প্রশিক্ষণ নিতে হবে আত্মরক্ষার কৌশলের। মনে জোর রাখতে হবে, আত্মসম্মানের জন্য আমরা প্রাণপণ লড়ব এবং লড়ার মনোভাব গড়ে তুলব সবার মধ্যে। হয়তো এতেই কিন্তু পরিবর্তন আসতে পারে।

তবে যতই কৌশল গ্রহণ করি না কেন, মানুষ যদি তার আদিম প্রবৃত্তি ও বর্বরতা থেকে বেরিয়ে আসতে না পারে— বিকৃত যৌন চেতনার অবদমন ঘটাতে না পারে— সবই হবে বিফল। তাই দরকার নীতিশিক্ষার। বিদ্যালয় থেকে নীতিশিক্ষার বিষয়গুলি বাদ দেওয়ার ফলে আমাদের সমাজের অনেক সর্বনাশ করা হয়েছে। তার বিষময় ফল এখন ফলতে শুরু করেছে। তাই আবার পাঠ্যসূচিতে নীতিশিক্ষা ফিরিয়ে আনতে হবে। 'মাতৃবৎ পরদারেষু' আদর্শকে মূর্ত করতে হলে ছোট থেকেই ছেলে-মেয়ে সবাইকেই নীতি-শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে হবে। তবেই হবে প্রকৃত শিক্ষা। এছাড়া বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে নারীশরীর প্রদর্শনের বাড়াবাড়িও বন্ধ করতে হবে। বর্তমান যুগে বিপথে পরিচালিত করার সব উপকরণ হাতছানি দেয় অনবরত— তাই দরকার আত্মসংযম। এই মানসিক দৃঢ়তা পুরুষের মধ্যে এলে তবেই প্রকৃত নারীস্বাধীনতার অঙ্গীকার সার্থক হবে; নইলে একদিকে যেমন চলবে নারীস্বাধীনতার স্লোগান অন্যদিকে চলতে থাকবে নারী নির্যাতন ও অবমাননা। আর চলতে থাকবে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কাণ্ডজ্ঞানহীন মন্তব্য— দোষারোপ পালটা দোষারোপ।□

মোবাইল টাওয়ারের তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ শরীরের পক্ষে মারাত্মক

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

শহর-গ্রামগঞ্জে মোবাইল টাওয়ার বসছে। সরকারি আইনকে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে। সরকারের বিভিন্ন দপ্তরও সায় দিচ্ছে তাতে। দূষণের তোয়াক্কা না করে আগাছার মতো গজিয়ে উঠছে মোবাইল টাওয়ার। অনেকেই জানেন, উন্নত দেশের পরিত্যক্ত প্রযুক্তি চালান হয়ে এসেছে এই গরিব দেশে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা যদি-বা কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলছে, বেসরকারি কোম্পানিগুলি তার ধারও ধারছে না। কে না জানেন, মুনাফাবাজ কর্পোরেট ব্যবসায়ীদের চরিত্র সব দেশে, সব কালে এক। তাঁরা কবে জনস্বার্থের কথা ভেবে কাজ করছেন।

তড়িৎচুম্বকীয় দূষণ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা ওয়াকিবহাল হলেও জনসাধারণ নন। কেউ অর্থ লাভের আশায় টাওয়ার বসানোর জন্য জমি বা ছাদ ছেড়ে দিচ্ছেন বহুজাতিক কোম্পানিকে। পাড়া-প্রতিবেশী উদাসীন দর্শক। এর ফল ভুগছেন প্রতিবেশীরা। তার সঙ্গে গোটা সমাজ। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিদ্যুতায়নের সময় তড়িৎচুম্বকের দূষণ থেকে জনসমাজকে সুরক্ষিত রাখতে হাইটেনশন লাইনগুলি টাওয়ারের মাথায় চাপিয়ে জনবসতি থেকে দূরে মাঠ-ঘাট পেরিয়ে ফাঁকা মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। টেলিফোনের তার বসাতেও সরকার নানা সাবধানতা নিত। এখন আর তা করছে না। বাধা দিচ্ছে না বেসরকারি কোম্পানিগুলিকেও। কর্পোরেটকে জায়গা করে দিতে পাড়া-প্রতিবেশী-পঞ্চায়েত-আমলা এক অদ্ভুত আঁতাত তৈরি হয়েছে একালে। মোবাইল কোম্পানির রক্ষাকবচ হিসেবে এরা কাজ করছে। এর জেরে বিপন্ন সাধারণ মানুষ।

মোবাইল টাওয়ারের জন্য পাখিরা আর শহরে আসছে না।

নারকোলের সাইজ ক্রমশ ছোটো হচ্ছে। বদলে যাচ্ছে স্বাদ।

বুকপকেটে মোবাইল রাখালে হার্টের সমস্যা হতে পারে।

কোমরে মোবাইল গুঁজে রাখলে ছেলেদের যৌন ক্ষমতা কমে যেতে পারে।

মোবাইল ফোনে বেশি কথা বললে কানে শোনার সমস্যা হতে পারে।

তাই বলে মোবাইল বর্জন? নৈব নৈ চ। এ যুগে মোবাইল ছাড়া দিন চলে না। এগোনো যায় না এক-পাও। তাছাড়া মোবাইল বর্জন করার কথা উঠছে কেন? মোবাইল ফোনের যে ক্ষতির কথা বলা হচ্ছে, সে বিষয়ে মানুষ সচেতন নয়।

বাস্তব পরিস্থিতি : তড়িৎচুম্বকীয় বিকরণের সবচেয়ে বড়ো আশঙ্কার দিকটা হলো, এটা চোখে দেখা যায় না। নিঃশব্দ ঘাতকের মতো এর চরিত্র। যেহেতু পাঁচটা ইন্দ্রিয় দিয়ে একে টের পাওয়া যায় না, তাই এটা বিশ্বাস করা বেশ শক্ত যে, আমরা এখন এমন এক দুনিয়ায় বাস করছি, যার আকাশ-বাতাস ভরা তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের ধোঁয়ায়। যাকে বলে, ইলেকট্রো স্মগ।

তড়িৎচুম্বকীয় দূষণের প্রভাব : কীসের প্রভাবে কোন রোগ-ব্যাধি তা জানার জন্য নানা পরীক্ষানিরীক্ষা হয়। সন্দেহজনক বস্তুটিকে রেখে এবং বাদ দিয়ে এহেন পরীক্ষা চলে নানাভাবে। তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের প্রভাবে নানা অসুখবিসুখ হতে পারে বলে সন্দেহ বিজ্ঞানীদের। কিন্তু বিকিরণের প্রভাবেই সেইসব রোগ হচ্ছে কি না, তা জানার জন্য যেখানে বিকিরণ আছে এবং যেখানে বিকিরণ নেই— এমন দু'জায়গা থেকেই তথ্য নিয়ে পরীক্ষা চালানোর কথা। আগে এমন পরীক্ষা হয়েছে কি না, জানা যায়নি। কিন্তু আজ এই ধরনের পরীক্ষা চালানো বাস্তবে অসম্ভব। কারণ তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণের প্রভাবমুক্ত জায়গা এ দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। তবু তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ ও শরীর-স্বাস্থ্যে তার প্রভাব নিয়ে পুরনো নতুন তথ্য ঝাড়াই বাছাইয়ের পর বহু বিজ্ঞানী আজ নিশ্চিত যে, মোবাইল প্রযুক্তি তথা তড়িচুম্বকীয় দূষণে প্রভাবিত হতে পারে অনেক কিছুই। যেমন— হৃদ্‌স্পন্দন থেকে মস্তিষ্কের ক্রিয়াকলাপ, রক্ত ও মস্তিষ্কের সংযোগ, ঘুম, চোখ, অণ্ডকোষ, ত্বক, শ্রবণশক্তি, শরীরের ক্যালসিয়াম, মেলাটোনিন, গ্লুকোজ বিপাক এবং সার্বিক স্বাস্থ্য— কী নয়। এই সব কারণে নানা অসুখবিসুখও হতে পারে।

তবে একটা কথা পুরোপুরি ঠিক। তড়িচুম্বকীয় দূষণের জন্য হাতের ফোনটি নিশ্চয়ই দায়ী। কিন্তু তার চেয়ে বহু গুণ দায়ী মোবাইল টাওয়ার। এ কেবল জানেন ভুক্তভোগীরাই। তবে চিন্তার ব্যাপার, তড়িৎচুম্বকীয় দূষণের ভয়াবহতা নিয়ে এখনও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতো জনস্বাস্থ্যের উমেদাররা কোনো গম্ভীর প্রতিক্রিয়া দেখায়নি। আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী বা মানবাধিকার সংগঠনগুলিও কিছুটা চুপচাপ। □

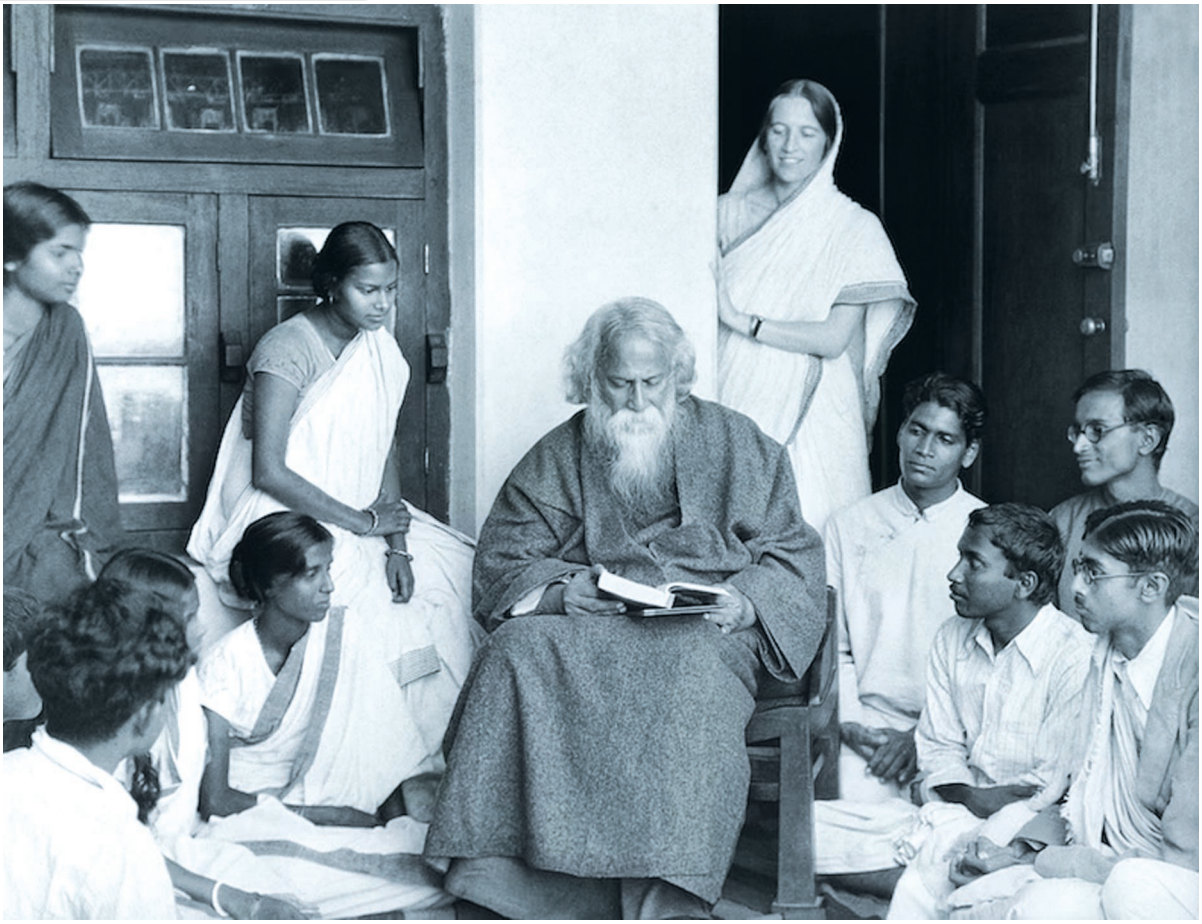

শান্তিনিকেতনে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে

রবীন্দ্রনাথের সকল প্রয়াসের মধ্যেই রাষ্ট্রবোধ থরেবিথরে সাজানো আছে

কল্যাণ গৌতম

রবীন্দ্রনাথের অনুভবে ভারতবর্ষের মর্যাদা কোথায় তার একটি উদাহরণ দিই। রবীন্দ্রনাথ তখন ইংল্যান্ডের কেনসিংটনে রয়েছেন। কবিবন্ধু ডি.এল রায়ের পুত্র দিলীপ কুমার রায়ও সেখানে উপস্থিত। দু'জনে গল্প করছেন। এমন সময় কয়েকজন ভারতীয় যুবক এলেন কবির কাছে এবং কবিকে অনুরোধ করলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগে জেনারেল ডায়ারের গুলিতে প্রাণ বিসর্জন দেওয়া নরনারীর স্মৃতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় তাঁকে সভাপতিত্ব করতে হবে। অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে কবি তৎক্ষণাৎ বললেন, তোমাদের একটুও লজ্জা করে না? পশুর মতো মার খেয়েছি, হামাগুড়ি দিয়ে অনেকে প্রাণ বাঁচিয়েছি— সেই গ্লানির কথা, সেই চরম অপমানের কথা হাটে-বাজারে বৃহৎ গলায় প্রচার করবে? এটা কী আন্দোলনের সাফল্য হতে পারে? ইংল্যান্ডের মানুষ বলবে, যারা পাশবিক অত্যাচার এবং নির্যাতন সত্ত্বেও মুখ বন্ধ করে থাকে, আর্তনাদ করে হামাগুড়ি দিয়ে প্রাণ বাঁচায়, তারা অমানুষ ও জন্তু। অতএব তাদের গুলি করে মারা ঠিক হয়েছে। তিনি আরও বললেন, এই ঘটনা ভারতবাসীর ভয়ংকর গ্লানি, তা ঢাক পিটিয়ে কোমর বেঁধে প্রচার করার নয়। বললেন, সেই ঢাকিদের দলে তাঁকে ভর্তি করার মিথ্যা চেষ্টা যেন না করা হয়। কবির মুখ রাগে রাঙা হয়ে উঠেছিল সেদিন।

অথচ এই কবিই তো ১৯১৯ সালের মে মাসে জালিয়ানওয়ালাবাগের প্রকৃত সংবাদ অবগত হয়ে, অ্যান্ড্রুজের মাধ্যমে গান্ধীজীর প্রতি দৌত্যে ব্যর্থ হয়েছিলেন। গান্ধীজী-রবীন্দ্রনাথ একত্রে আইন অমান্য করে পঞ্জাবে প্রবেশ করবেন এবং গ্রেপ্তার বরণ করবেন— সেই ইচ্ছায় বাধা পেয়েছিলেন। সেদিন চিত্তরঞ্জন দাশের প্রতিবাদ-উদাসীনতাতে ব্যথিত হয়ে নিজেই প্রতিবাদে শামিল হয়েছিলেন। ব্রিটিশ-প্রদত্ত 'নাইটহুড' (স্যার টাইটেল) ত্যাগ করে

প্রতিবাদপত্র লিখেছিলেন ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে। আর এই প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আপন মনের কাঁটা উপড়িয়ে ফেলেছিলেন। তিনি কোটি কোটি ভারতবাসীর প্রতিবাদকে বাণীদান করেছিলেন। অতএব কেনসিংটনে কবির মনস্তত্ত্ব আন্দাজ করে বলতে পারি, যদি জালিয়ানওয়ালাবাগের সেই বুলেটবিদ্ধ জাতি বুলেটের শেল ভেতর থেকে উদ্‌গীরণ করে ব্রিটিশের ঔদ্ধত্যকে ফিরিয়ে দিতে না পারে, তবে তা দেশবাসীর পরাজয়ের পরাকাষ্ঠা হয়েই চিহ্নিত হয়ে থাকবে। দেশবাসী দেখেছে ২৬ এপ্রিল, ১৯১৯ পঞ্জাবের খবর রবীন্দ্রনাথের কানে আসবার পর তিনি প্রকৃত সত্য জানতে খবর নিতে সি.এফ. অ্যান্ড্রুজকে দিল্লি পাঠিয়েছেন। চিঠির লেন-দেনও হয়েছিল। সেই সূত্রে 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠি লিখেছিলেন, জানিয়েছিলেন মনের তাপমানযন্ত্রের কথা। অ্যান্ড্রুজ দিল্লি হয়ে পঞ্জাব প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কবির অনুরোধে তিনি গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে বোম্বাই গিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যর্থ মনোরথ হয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে আসতে হয়েছিল। ব্যথিত কবি পঞ্জাবে অবস্থানকারী রবীন্দ্র-স্নেহধন্য লেডি রাণু মুখার্জিকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, 'আকাশের তাপ আমি একরকম সইতে পারি। মর্ত্যের প্রতাপ আর সহ্য হয় না।... এই দুঃখের তাপ আমার বুকের পাঁজর পুড়িয়ে দিলে।' এই হলেন রাষ্ট্রবাদী রবীন্দ্রনাথ! কবির তখন বয়স প্রায় ষাট।

এবার জেনে নিই রবীন্দ্রনাথের ছোটোবেলাকার কথা। পৃথ্বীরাজের পরাজয় কাঁদিয়েছিল 'হিন্দুমেলা'র আয়োজক-পরিবারের ছোট্ট রবিকে। তখন তাঁর উপনয়ন হয়ে গেছে। হিমালয় ভ্রমণের আগে তিনি লিখলেন 'পৃথ্বীরাজের পরাজয়' নামে এক বীররসাত্মক কাব্য। যদিও সেই কাব্যগ্রন্থের পাণ্ডুলিপি পরে আর পাওয়া যায়নি। কী ছিল সেই কাব্যে? কেন শিশু রবি পরাজিত হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজকে নিয়ে এমন কাব্য রচনা করতে গেলেন? রবীন্দ্র জীবনীকার প্রশান্ত কুমার পাল এ প্রসঙ্গে লিখছেন, 'জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির স্বাদেশিকতার আবহাওয়া এবং হিন্দুমেলার হিন্দু জাতীয়তাবোধের আদর্শে পরিবর্ধিত রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে হিন্দু রাজা পৃথ্বীরাজের বীরত্ব উজ্জ্বলভাবে দেখা দেবে এবং তাঁর পরাজয়ে বেদনা অনুভব করবেন এটাই স্বাভাবিক।' তাঁর কিশোর মনে তুর্কি বাদশা মহম্মদ ঘোরি কর্তৃক পৃথ্বীরাজের পরাজয় ছিল একটা গভীর-ঘন বেদনা, যা কোনোদিনই তিনি ভুলতে পারেননি। আর এই কিশোর-বেদনাই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে আগ্রহ তৈরি করেছে হিন্দু-ইতিহাস-চেতনায় এবং তা থেকেই ক্রমান্বয়ে জাগ্রত হয়েছিল কবির দেশপ্রেম, রাষ্ট্রবোধ। তাঁর নানান লেখার মধ্যে পরতে পরতে, থরে-বিথরে ছড়িয়ে আছে হিন্দু সনাতনী-সংস্কৃতির মেজাজ। সাহিত্যে যা যা চিত্রকল্প আঁকলেন তিনি, তা হিন্দু সমাজেরই। বৌদ্ধ, শিখ, জৈন সম্প্রদায়কেও তিনি বৃহত্তর হিন্দু সমাজের সঙ্গেই গ্রহণ করেছেন, লালন করেছেন। একথা কেউই অস্বীকার করতে পারেন না।

আমরা দেখতে পাই হিন্দুমেলার প্রবর্তনের মধ্যে (১৮৬৭ সালের চৈত্রসংক্রান্তি) ছিল ভারতবাসীর জাতীয় পরাভবের গ্লানি ও ব্রিটিশ শাসন-শোষণ থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে এবং রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও প্রবহমান ছিল হিন্দু স্বাদেশিকতার ভাব। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা ছিল অনন্য। ১৪ বছর বয়সেই তিনি লিখছেন 'হিন্দুমেলার উপহার'। ১৫-১৬ বছর বয়স থেকে স্বদেশি গান রচনা করতে শুরু করলেন। স্বদেশব্রতের এক নির্ভীক প্রতিবাদী ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠলেন। ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন-সন্ত্রাস- হিংস্রতার বিরুদ্ধে তিনি উচ্চারণ করলেন প্রতিবাদ ও ধিক্কার। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সময় (১৯০৫) যখন তাঁর বয়স ছিল ৪৪ বছর, তখনই তাঁর স্বদেশি গানের সমৃদ্ধতম সময়। কখনও প্রত্যক্ষে, কখনও নেপথ্যে তিনি ভারতের মুক্তি সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বদেশ গৌরব গান রচনা ও জনপ্রিয়তা তারই অনুষঙ্গে বিচার করতে হবে। তাঁর 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানের সংখ্যা ৪৬। তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দেমাতরম্' গানে সুর দিয়ে তাঁকেই শুনিয়েছিলেন ১৮৮৬ সালে। এই গানটি রবীন্দ্রনাথ কংগ্রেসের অধিবেশনেও গেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের ৫০ বছর বয়সে লেখা গান 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' আজ ভারতের জাতীয় সংগীত। ২৭তম কংগ্রেস অধিবেশনে গানটি গাওয়া হবে, তাই রবীন্দ্রনাথ এই গানটি লিখেছিলেন। ১৯৩৬ সালের ২৮ অক্টোবর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই গানকে জাতীয় সংগীতের স্বীকৃতি দেয়।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রভাবনার অন্যতম প্রধান দিক হচ্ছে ঐতিহ্যের অনুবর্তন। রবীন্দ্রনাথ রামায়ণে জারিত ছিলেন। তাই তিনি বুঝেছিলেন, শিশুপাঠ্যে শিশুকে সবসময় নিজের দেশের ঐতিহ্যের মধ্যে ঘোরাফেরা করতে দিতে হবে। ঐতিহ্যের শিক্ষার মধ্যেই সবচাইতে ভালোভাবে শিক্ষিত করা সম্ভব দেশবাসীকে। তাদের যথোপযুক্ত নাগরিক হয়ে উঠতে সহায়তা করে দেশ ও ঐতিহ্য। ঐতিহ্যের প্রতি টান, ঐতিহ্য-বিষয়ক জ্ঞান একেবারে ছোটোবেলা থেকেই আসা দরকার। রবীন্দ্রনাথ বুঝিয়েছেন 'রাম' বলতেই ভারতীয় শিশুর কাছে এক অমোচ্য চিত্র ফুটে ওঠা দরকার। সেই অনুষঙ্গে তিনি দু'ভাবে শিশুকে রামায়ণের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিচ্ছেন, নামবাচক শব্দে এবং প্রকৃতি চিত্রণে। কখনো নাম না বলেই শিশু রামায়ণে পাড়ি দিয়েছে— 'মা গো, আমায় দেনা কেন/একটি ছোটো ভাই—/দুই জনেতে মিলে আমরা/বনে চলে যাই।' এখানে নাম না করেও শিশু নিজের সঙ্গে শ্রীরামকে অভেদ কল্পনা করছে, ছোটো ভাইটি যে সহোদর লক্ষ্মণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না। প্রকৃতি চিত্রণেও রামের বনবাস জীবন শিশুর কল্পনার নাগালে মুহূর্তেই চলে আসে— 'চিত্রকূটের পাহাড়ে যাই/এমনি বরষাতে...।' রাজপুত্রের বনবাসী হয়ে যাওয়া বাঙ্গালি তথা ভারতীয় শিশুর মানস-কল্পনায় কতটা প্রভাব এনেছিল, 'সহজপাঠ'-এর একটি কবিতায় কবি তা এক লহমায় ধরে দিয়েছেন— 'ওইখানে মা পুকুরপাড়ে/জিয়ল গাছের বেড়ার ধারে/হোথায় হব বনবাসী—/

খুলে গেল মর্মচক্ষু। ১৯২১ সালে কৃষিবিজ্ঞানী এলমহার্স্টের সহযোগিতায় সুরুল গ্রামে শুরু করলেন স্কুল অব এগ্রিকালচারের কাজ। এদিকে বিশ্বভারতীর সদ্য-স্নাতকরা সমাবর্তনে কবির কাছ থেকে পাচ্ছেন ছাতিম শাখার অভিজ্ঞান; গাছের শ্যামলিমার চিরনূতন রূপ। বনস্পতির বৃহৎ গুঁড়ির মতো সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্বশীল হচ্ছেন, হয়ে উঠছেন স্নেহপ্রবণ শিক্ষাবিদ। বহুমাত্রিক, বহুমুখী, বহুবর্ণময় রবীন্দ্রনাথের সমস্ত সৃষ্টি, সকল প্রয়াসের মধ্যেই দেশপ্রেম ও

কেউ কোথাও নেই।/ওইখানে ঝাউতলা জুড়ে বাঁধবো তোমার ছোট্ট কুঁড়ে,/শুকনো পাতা বিছিয়ে ঘরে/থাকব দুজনেই।' এই শিকড়-সংস্কৃতির সাধনা রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রভাবনার উল্লেখযোগ্য দিক। অযোধ্যার রঘুপতি রামকে তিনি কোন উচ্চতায় রেখেছিলেন, তার প্রমাণ এই কবিতাটি—

'...কহো মোরে, বীর্য কার ক্ষমারে করে না অতিক্রম,
কাহার চরিত্র ঘেরি সুকঠিন ধর্মের নিয়ম
ধরেছে সুন্দর কান্তি মাণিক্যের অঙ্গদের মতো,
মহৈশ্বর্যে আছে নম্র, মহাদৈন্যে কে হয়নি নত,
সম্পদে কে থাকে ভয়ে, বিপদে কে একান্ত নির্ভীক,
কে পেয়েছে সবচেয়ে, কে দিয়েছে তাহার অধিক,
কে লয়েছে নিজ শিরে রাজভালে মুকুটের সম
সবিনয়ে সগৌরবে ধরা মাঝে দুঃখ মহত্তম—
কহো মোরে, সর্বদর্শী হে দেবর্ষি, তাঁর পুণ্য নাম।'
নারদ কহিলা ধীরে, 'অযোধ্যার রঘুপতি রাম।'

আমরা দেখেছি, রবীন্দ্র-প্রতিভা বহুমুখী। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য নিজে লিখেছেন, '...শিক্ষাসংস্কার এবং পল্লীসঞ্জীবনই আমার জীবনের প্রধান কাজ'। এই পল্লী সঞ্জীবনের মধ্যে প্রকৃতি কবিকে আকর্ষণ করছে সবচাইতে বেশি। এই প্রকৃতির সামীপ্যে থেকেই তাঁর রাষ্ট্রভাবনা গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়েছে। প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির সান্নিধ্যে থাকা মানুষের জন্যও ভাবতে শুরু করলেন। ভাবনা শুরু হলো কৃষির উন্নতির লক্ষ্যে। প্রকৃতি-যাপনের মধ্যে দেশের মাটিতে মাথা ঠেকালেন। সেই অনুষঙ্গে কৃষিতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহার করার রবীন্দ্র-মানস ছড়িয়ে গেল। হাতে-কলমে কৃষিশিক্ষা ও আদর্শ গ্রাম তৈরির পরিকল্পনায় জড়িয়ে গেলেন তিনি। দেশের মাটি ও মানুষের উন্নয়নের জন্যই ১৯০৬ সালে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে আমেরিকার ইলিয়ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষিবিজ্ঞান পড়তে পাঠালেন। শান্তিনিকেতন শ্রীময়ী রূপ পেল রবীন্দ্রনাথের জন্যই। গ্রাম জীবনকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে গিয়ে দেশ দেখা হতে লাগল,

রাষ্ট্রবোধ থরেবিথরে সাজানো আছে। এমনকী তাঁর লোকসংস্কৃতি চর্চাতেও। দেশের প্রতি, জাতির প্রতি দেশজ ঐতিহ্যের প্রতি দায়বদ্ধতা থেকে তিনি লোকসংস্কৃতির উপাদান সংরক্ষণ করেছেন। গানে মিলিয়ে দিয়েছেন লোকসংগীতের সুরের মূর্ছনা। উপলব্ধি করেছেন দেশজ সাহিত্যের নিম্নাংশ কীভাবে স্বদেশের মাটির মধ্যে অনেকটা পরিমাণে জড়িয়ে ঢেকে আছে। তাঁর সাহিত্যের মধ্যেও লোকসাহিত্যের কল্পজগৎ। চেতনার স্তরে রাঙিয়ে নানান খণ্ডচিত্রে উপস্থাপিত লোকসংস্কৃতি। তাঁর শিকড়-সংস্কৃতির সরাসরি চর্চা নিদর্শন হচ্ছে লোকসংস্কৃতি বিষয় কয়েকটি সরাসরি প্রবন্ধ— ছেলে ভুলানো ছড়া, কবিসংগীত এবং গ্রাম্য সাহিত্য।

রবীন্দ্রনাথের জন্ম ও মৃত্যু ব্রিটিশ ভারতে। বিদেশি ঔপনিবেশিক শাসনে থেকেও তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার একটি পরিষ্কার চিত্র খুঁজে পাওয়া যায়। রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি ছিলেন বাস্তবানুগ। তিনি 'বাহিরের অনুগ্রহে বাহ্য স্বরাজ' চাননি। বিদেশি শাসকের দাক্ষিণ্য ভিক্ষা চাননি, চেয়েছিলেন জাতীয় আত্মশক্তির উদ্বোধন। স্বরাজ যে সুতো কেটে, খদ্দর পরে, উপদেশের বন্যা বইয়ে সম্ভব নয়, তা তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন। চরকার চালনা তাঁর কাছে 'যান্ত্রিক' মনে হয়েছে। এ বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে তাঁর প্রবল মতপার্থক্য ছিল। জাতিকে ভেতর থেকে উদ্বোধিত করার জন্য পঞ্চায়েত বিধিব্যবস্থা এবং সমবায় প্রণালী অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি লিখছেন (অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬), 'আমি প্রথম থেকেই রাষ্ট্রীয় প্রসঙ্গে এই কথাই বারবার বলেছি, যে কাজ নিজে করতে পারি সে কাজ সমস্তই বাকি ফেলে, অন্যের উপরে অভিযোগ নিয়েই অহরহ কর্মহীন উত্তেজনার মাত্রা চড়িয়ে দিন কাটানোকে আমি রাষ্ট্রীয় কর্তব্য বলে মনে করিনে।' ইদানীং বহু মানুষকে দেখা যায়, রাষ্ট্রের জন্য যে কাজটি তিনি চেষ্টা করলে করতে পারেন, তা না করে, যুক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে রাষ্ট্রবাদী সেজে বসে আছেন। রবীন্দ্রনাথের জীবন ও ভাবনাকে অনুধ্যান করে তাঁরা যদি আপন সামর্থ্যে কিছুটা অগ্রসর হন, তবে তাঁর জন্মদিনে শ্রদ্ধা নিবেদন সার্থক হয়।

রবীন্দ্রনাথ মননে বাঙ্গালি চেতনায় ভারতীয়

ড. রাজলক্ষ্মী বসু

এক আকাশ রবীন্দ্রনাথকে যদি কর্ষণ করতে শুরু করি তবে ধরা পড়বে স্বদেশি রবীন্দ্রনাথ, রাষ্ট্রবাদী রবীন্দ্রনাথ এবং বাঙ্গালিয়ানার মিশেল তো বটেই। রবীন্দ্রনাথ এবং রাষ্ট্রীয়তার অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁর এক সাধনা যা তাঁর সাহিত্য থেকে ভাষণে বহুমাত্রিক ভঙ্গিতে ধরা পড়েছে বারে বারে। সাহিত্যের পাতাগুলি সবচেয়ে বেশি পল্লবিত হয় যখন তা হৃদয় কাঁপানো কোনো আহ্বানে সাড়া দেয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল তেমনই এক সোচ্চার প্রতিবাদ যার নিউক্লিয়াস রবিঠাকুর। বাঙ্গালি প্রাণা রবি ঠাকুর যে সমান্তরাল ভাবে একই যোগে একই গতির দেশাত্মবোধ-মননের অধিকারী তা প্রত্যক্ষ করেছিল ইতিহাস। আসলে এই স্বাদেশিকতার ভিত্তি ছিল অনেক উর্বর। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশ ছিল দেশাত্মবোধক। রাষ্ট্রবোধ জাগরণের স্বর্ণভূমি। রবীন্দ্রনাথের সেই চেতনার উন্মেষ হয়েছিল 'হিন্দু মেলা'য়। সেই মেলায় দেশজননীর স্তবগান, গীত, কবিতা, দেশীয় শিল্প প্রদর্শনী কী ছিল না। হিন্দু মেলার নবম অধিবেশনে রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রবাদী মননের পূর্ণ রূপ উন্মিলিত হতে শুরু করে। স্বাদেশিকতার আহ্বানে সেবার তিনি অধিবেশনে উপহার এনে দিলেন।

'ভারত কঙ্কাল আর কি এখন,
পাইবে হায় রে নূতন জীবন;
ভারতের ভস্মে আগুন জ্বালিয়া,
আর কি কখনো দিবে রে জ্যোতি!
তা যদি না হয় তবে আর কেন,
হাসিবি ভারত! হাসিবি রে পুনঃ,
সে-দিনের কথা জাগি স্মৃতিপটে,
ভাসে না নয়ন বিষাদ জলে?'

ভারতের দুর্দিনে দিল্লিতে যখন ১৮৭৭-এ সভা বসল। আত্ম-সম্মান বিসর্জনকারী নৃপতিদল যখন ইংরাজের জয়গান গাইছে। তখন কবি লিখেছেন :

'ব্রিটিশ রাজের মহিমা গাহিয়া
ভূপগণ ঐ আসিছে ধাইয়া।
হায় রে হতভাগ্য ভারত ভূমি
কণ্ঠে এই তোর কলঙ্কের হার
পরিবারে আজি করি অলংকার।
গৌরবে মাতিয়া উঠেছে সবে
তাই কাঁপিতেছে তোর বক্ষ আজি
ব্রিটিশ রাজের বিজয় রবে।
ব্রিটিশ বিজয় করিয়া ঘোষণা,
যে গায় গাক আমরা গাব না,
আমরা গাব না হরষ গান,
এসো গো আমরা যে ক'জন আছি
আমরা ধরিব আরেক তান।'

রবীন্দ্র পূজন এক নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্র, তা করতে করতে সমুদ্র থেকে যে ক'টি জলকণাসম উদাহরণ যোগে নিবন্ধ সৃষ্টির চেষ্টা হলো— তা স্বদেশি এবং বাঙ্গালি রবীন্দ্রনাথের মনন মনীষা অন্বেষণের এক আপ্রাণ প্রচেষ্টা। রবি ঠাকুরের এই সত্তাকে খোঁজার প্রচেষ্টা আবহমানকাল ধরে চলবে।

যখন রবীন্দ্রনাথ এই তান ধরেছেন তখন তিনি সত্যিই কাঁচা বয়সের। কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রবোধের পরিপক্কতায় মুগ্ধ যোগেশ চন্দ্র বাগল 'জাতীয়তার নবগ্রন্থ'তে উল্লেখ করেন 'যখন দেখিলাম যে বঙ্গের একটি সুকুমারমতি শিশু ভারতের জন্য এরূপ রোদন করিতেছে, যখন দেখিলাম যে তাহার কোমল হৃদয় ভারতের অধঃপতনে ব্যথিত হইয়াছে, তখন আশাতে আমার হৃদয় পরিপূর্ণ হইল। তখন ইচ্ছা হইল রবীন্দ্রনাথের গলা ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলি— আয় ভাই আমরা গাইব অন্য গান। একজন সুপরিচিত কবিও সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি দ্রবিত হৃদয়ে বলিলেন, 'যখন এই কবি প্রস্ফুটিত কুসুমে পরিণত হইবে, তখন দুঃখিনী বঙ্গের একটি অমূল্য রত্ন লাভ হইবে।' বঙ্গ সত্যিই সেই রত্ন পেল যখন রবিঠাকুর যৌবনে দৃপ্ত তখন বঙ্গভঙ্গে তাঁর স্বদেশপ্রেমিক ভূমিকা প্রত্যক্ষ করল সারা দেশ।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন রবি ঠাকুরের দ্বৈত সত্তার প্রমাণ, যিনি মননে বাঙ্গালি আর চেতনে রাষ্ট্রবাদী। সেদিন বাঙ্গালির কাছে রবীন্দ্রনাথ মাতৃরূপে উদ্ভাসিত। স্বাধীনতা আন্দোলনের মহাযজ্ঞের পুরোহিত রবি ঠাকুর যেভাবে তখন দেশবন্দনা করছেন তার স্মরণে প্রভাত মুখোপাধ্যায় বলেছেন, 'স্বদেশি আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীতগুলি ছিল তাহাদের রণসংগীত তুল্য'। ১৯০৫-এর সেই সব গান 'এবার তোর মরা গাঙে', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে', 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি', 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা', 'এখন আর দেরি নয়, ধর গো তোরা হাতে হাতে ধর গো', 'বাংলার মাটি বাংলার জল', 'বিধির বিধান কাটবে তুমি এমন শক্তিমান', 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি', 'নিশিদিন ভরসা রাখিস ওরে হবেই হবে', 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি বারে বারে হেলিস না ভাই', 'আমি ভয় করব না'— যেন অতন্দ্র প্রহরী। যেন দেশপ্রেমের মৌতাত। স্বয়ং রমেশ চন্দ্র মজুমদার বলছেন, 'ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার অপূর্ব সংগীত ও কবিতায় স্বদেশি আন্দোলনকে যে মর্যাদা দিয়েছেন ও উচ্চ স্থানে প্রতিষ্ঠিত

করিয়াছেন বিশ্ব সাহিত্যে তাহার কোনো তুলনা আমার জানা নেই।' বঙ্গভূমি ও ভারতবর্ষ যেন জননীরূপে আবির্ভূতা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল কবির চেতনে। চিন্তা ও অনুভূতির বর্ণাঢ্য তুলিতে কবি দেশজননীর যে হিরণ্ময়ী রূপ ধারণ করেছেন তা যেন দেশজননী এবং বিশ্বদেবের যুগল মূর্তি। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি মূর্তি প্রত্যক্ষ করে লিখছেন :

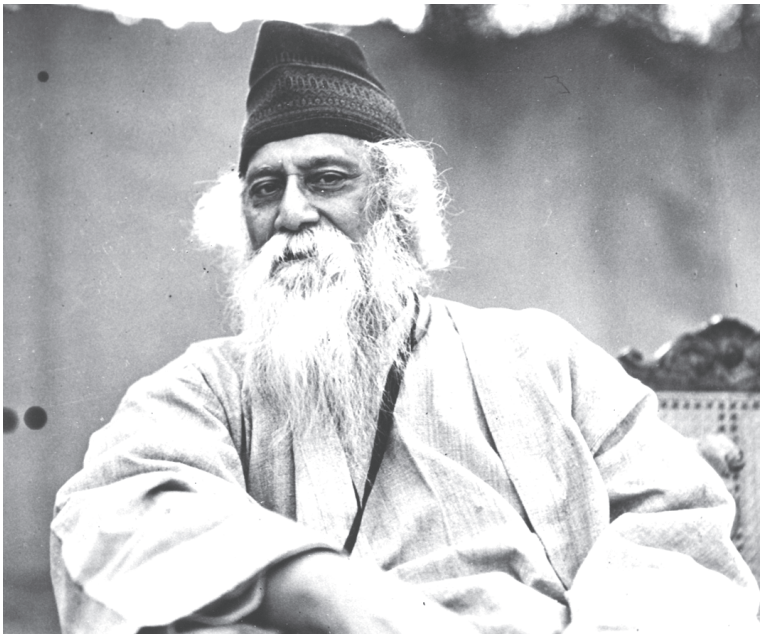

'হে বিশ্বদেব, মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কি বেশে।
দেখিনু তোমারে পূর্ণ গগনে,
দেখিনু তোমারে স্বদেশে।
হৃদয় খুলিয়া চাহিনু বাহিরে,
হেরিনু আজিকে নিমেষে—
মিলে গেছে ওগো বিশ্বদেবতা,
মোর সনাতন স্বদেশে।' (উৎসর্গ)

কখনও-বা জন্মভূমির কোমল রূপে অনুভব করেন প্রখর তেজ—

'ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাতে করে শঙ্কা হরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাট নেত্র আগুনবরণ।
তোমার মুক্ত কেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশ তলে রৌদ্র বসনী'!

এ যেন ভারতমায়ের শাশ্বত রূপ বর্ণনা যা তাঁর অন্তঃকরণের দেশভক্তির নিষ্কলঙ্ক প্রমাণ। কবি স্বদেশি আনন্দে গান বাঁধলেন :

'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে—
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে, দেখা দিয়ে আয়রে মাকে।'

স্বদেশি আন্দোলনের পথ সহজ নয়। সে দুর্গম পথ যেন অবিরাম হয়। তাই কবি তখন লিখলেন :

'আমাদের যাত্রা হলো শুরু, এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক তুফান উঠুক ফিরব না গো আর
আমরা নিয়েছি দাঁড় তুলেছি পাল তুমি এখন ধরগো হাল, ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কী বা তার।'

রবীন্দ্রনাথ দেশেপ্রেমের আহ্বানে বার বার জাগ্রত করিয়েছেন বাঙ্গালিদের। রাষ্ট্রবোধে ঋদ্ধতা লাভ করে মৃত্যু ভয় ভুলে থাকার মন্ত্র দিয়েছেন তিনিই

'আমি ভয় করব না, ভয় করব না।
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না।'

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের ব্যাপক প্রবাহ জাতীয় জীবনে। তখন জেগে উঠল চরমপন্থী আন্দোলন। ইংরেজ অত্যাচারে দেশ জর্জরিত। দামাল ছেলেরা তখন মৃত্যুপাগল। তাদের উদ্দেশে কবি লিখছেন :

'বন্ধন শৃঙ্খল তার
চরণ বন্দনা করি করে নমস্কার—
কারাগার করে অভ্যর্থনা। রুষ্ট রাহু
বিধাতার সূর্য্য পানে বাড়াইয়া বাহু
আপনি বিলুপ্ত হয় মুহূর্তের পরে
ছায়ার মতন। ভীরুর শাস্তিই একমাত্র প্রসাদ—
সেই ভীরু নতশির শাস্তি ভারে
রাজকারা বাহিরিতে নিত্য কারাগারে।।'

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধারার। বাঙ্গালিকে তথা ভারতবাসীকে তিনি যে ভাবনায় জারিত করতে চেয়েছিলেন তা একদিকে যেমন আন্দোলনকেন্দ্রিক রাষ্ট্রবাদী, অন্যদিকে তাই আবার ভারতীয় ইতিহাস উপলব্ধির বৃহত্তর অধ্যায়। যে উপলব্ধির মধ্যমণি ছিল প্রাচীন ভারত, সনাতন সংস্কৃতি। তিনি আগ্রহী ছিলেন সমাজপ্রধান ভারতের শাসকপ্রধান ভারতের নয়। তবে এটা উল্লেখ করতেই হবে বঙ্কিমচন্দ্র যে 'হিন্দু ভারতের' উল্লেখ করেছেন সেই জাতীয়তাবাদ এবং রবি ঠাকুরের রাষ্ট্রীয়তাবোধে কিঞ্চিৎ তফাত আছে। রবি ঠাকুর যে সমন্বয়বাদী রাষ্ট্রবোধে আগ্রহী ছিলেন, তা বলাই বাহুল্য। ইউরোপের রেনেসাঁকে তিনি যেমন গ্রহণ করেছিলেন এবং জাতির উন্নতিকল্পে তা অবস্থা প্রেক্ষিতে প্রয়োগে সচেষ্ট ছিলেন তেমনই তিনি শোষকের বিরুদ্ধে বাঙ্গালিদের সরব হওয়ার সাহস জুগিয়েছেন বারে বারে। 'সিডিশন বিলের' বিরুদ্ধে তিনি কড়া ভাষায় লেখেন, 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধ। এবং ১৭-২-১৮৯৮ তারিখে কলকাতার টাউন হলে তা পাঠ করলেন। বঙ্গরাজকতা, এবার ফিরাও মোরেতে তিনি জুগিয়েছেন স্বাধীনতার উদ্দীপনা। খুব তাৎপর্যপূর্ণ কবির 'নৈবেদ্য' কবিতাটি। যেখানে ভক্তি ও তপোবন সংস্কৃতির পাশাপাশি শাসকের অন্যায় বিরোধী কণ্ঠ শব্দ সোচ্চার। তবে তিনি যে কী ভীষণ ভাবে বাঙ্গালিপ্রাণা তা আবারও ধরা দিয়েছে তাঁর দীর্ঘ প্রবন্ধ 'স্বদেশি সমাজ' (১৯০৪) এবং সম্পূরক রচনা 'অবস্থা ও ব্যবস্থা' (১৯০৫)-এ। এবং অতি অবশ্যই ১৯০৮-এর পাবনা সম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ তাঁর মনের বাঙ্গালি দরদ এবং

বাঙ্গালির জাতীয়তাবোধ বিষয়ক সুস্পষ্ট দলিল। রবি ঠাকুর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে নানামুখী ক্ষেত্র গড়ে তোলেন। জীবিকায় সমবায় ব্যবস্থা থেকে বাঙ্গলার গ্রামের স্বকীয় শাসন, একই সঙ্গে সাহিত্যে বিক্ষোভ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ— সব দিয়েছেন যা শুধুমাত্র বাঙ্গালির ঐক্যসাধনের হেতু, ভারতমায়ের বন্ধন মুক্তির হেতু। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদকে তিনিই আহ্বান জানান বাঙ্গলার ঐক্য সাধন যজ্ঞে যেন জেলায় জেলায় মেলা অনুষ্ঠান, হিন্দু-মুসলমানের মিলনের আহ্বান ঘটানো হয়। তাঁর মতে 'চিন্তার ঐক্য, ভাবের ঐক্য, ভাষায় ঐক্য, সাহিত্যের ঐক্য সাধনের মধ্যে দিয়ে বাঙ্গালির জাতীয় ঐক্য গড়ে তোলা সম্ভব। বাঙ্গালি বিপ্লবীদেরও প্রেরণা জুগিয়েছেন তিনিই। ১৯২৯-এ যখন যতীন দাস টানা ৬৩ দিন অনশন করছেন তখন রবি ঠাকুর লেখেন 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধ দাহ/ হে ভৈরব শক্তি দাও.../মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ।'

কেন ভুলে গেলাম 'তাসের দেশ'। যা তিনি বাঙ্গালির বীর সন্তান সুভাষ বসুকেই উৎসর্গ করে লেখেন 'স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে।' আন্দামানে বন্দি নেপাল মজুমদারের উদ্দেশে তিনিই কলম ধরেন। তাঁর প্রবন্ধ 'প্রচলিত দণ্ডবিধি' (১৯৩৭)-তে ইংরেজ ঘৃণায় বলেন, 'দণ্ড প্রয়োগের অতিকৃত রূপকে আমি বর্বরতা বলি।'

আরও একবার 'স্বদেশি সমাজ'-এর প্রসঙ্গ আনতেই হচ্ছে। রবি ঠাকুর যে মননে কতটা বাঙ্গালি-উন্নতি সচেতন ছিলেন তা এই প্রবন্ধের কিছু ছত্র উল্লেখ না করলেই না। 'কিন্তু এই সময়েই বাঙ্গালিকে নিয়ত স্মরণ করাইয়া দেওয়া দরকার যে, ঘর ও বাহিরের যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা যেন একেবারে উলটাপালটা হইয়া না যায়। বাহিরে অর্জন করিতে হইবে, ঘরে সঞ্চয় করিবার জন্যই। বাহিরে শক্তি খাটাইতে হইলেও হৃদয়কে আপনার ঘরে রাখিতে হইবে। শিক্ষা করিব বাহিরে, প্রয়োগ করিব ঘরে'। উল্লেখ্য, এই প্রবন্ধে তিনি প্রভেনশিয়াল কনফারেন্সের উল্লেখ করেন। যা দেশকে মন্ত্রণা দেওয়ার বীজ কিন্তু তার ভাষা আবার ইংরেজি!'

তখনই তিনি বাঙ্গালিদের আহ্বান করছেন শুধুমাত্র দেশি জিনিস নয়, দেশি ধাঁচের সভা করতে হবে। যা সবাইকে একসূত্রে বাঁধতে পারে। কবিগুরু বাঙ্গলার পল্লীতে পল্লীতে মেলা, যাত্রাপালা, কীর্তন, কথকতা রচনা, ম্যাজিক লণ্ঠন, ভোজবাজি আরও কতকিছুই না আয়োজন করতে উদ্যোগ নিতে বলেন। বাঙ্গালির স্বাজাত্যবোধ এবং অর্থনৈতিক সুপরিকল্পনা করলেন তিনিই। 'তাঁহারা যদি মোটের উপরে প্রত্যেক মেলার জন্য জমিদারকে একটা বিশেষ খাজনা ধরিয়া দেন এবং দোকানদারের নিকট হইতে যথানিয়মে বিক্রয়ের লভ্যাংশ আদায় কবিবার অধিকার প্রাপ্ত হন— তবে উপযুক্ত সুব্যবস্থা দ্বারা সমস্ত ব্যাপারটাকে বিশেষ লাভকর করিয়া তুলিতে পারেন। এই লাভের টাকা হইতে পারিশ্রমিক ও অন্যান্য খরচ বাদে যাহা উদবৃত্ত হইবে, তাহা যদি দেশের কার্যেই লাগাইতে পারেন, তবে সেই মেলার দলের সহিত সমস্ত দেশের হৃদয়ের সম্বন্ধ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিবে'। বাঙ্গালির স্বাবলম্বিতার এবং স্বাজাত্যবোধ ও রাষ্ট্রবোধের এমন সমীকরণ আগে আর কেউ করিয়েছেন বলে তো জানা নেই।

রবীন্দ্রনাথের রাষ্ট্রবোধ এবং বাঙ্গালিয়ানার মিশ্রণের অসমান্তরাল উদাহরণ বোধহয় 'গোরা' উপন্যাসে। যেখানে একই সঙ্গে হিন্দু সমাজ বনাম ব্রাহ্মসমাজ যেমন রয়েছে, আবার রয়েছে দেশমাতৃকার প্রতি প্রচণ্ড আবেগ, গভীর জাতীয়তাবোধ। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে জেগে ওঠা বাঙ্গালির বৃহত্তর রাষ্ট্রচেতনা। গোরা চরিত্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শিক্ষক চরিত্র যিনি ভারতবর্ষের বহুমাত্রিক রূপকে তুলে ধরেছেন। বাঙ্গালি গোরাই বিনয়কে বলছে, 'ভারতবর্ষের সর্বাঙ্গীণ মূর্তিটা সবার কাছে তুলে ধরো— তাহলে লোকে পাগল হয়ে যাবে, প্রাণ দেবার জন্য ঠেলাঠেলি পড়ে যাবে।' এই গোরাই কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের গ্রাম প্রান্তর দেখতে বেরোন। গোরা হিন্দুত্ববাদী। যদিও তাঁর অন্তরে অনেক দ্বন্দ্ব, তিনি কুসংস্কার বিরোধী। গোরা অনুভব করল স্বদেশপ্রেম কোনো বিচ্ছিন্ন অনুভূতি নয়। এ হলো ঐক্য সন্ধান। গোরার মুখেই রবি ঠাকুর ভাষা দিলেন, 'ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত। সকলের অন্নই আমার অন্ন।' নেশন গঠন করতে হলে আজকেও বাঙ্গালি তথা ভারতবাসীকে আবার বার বার গোরার শব্দ গভীরতায় অবগাহন করতে হবে। তবে যদি কিছুটা বুঝতে পারি দেশপ্রেমিক বাঙ্গালি রবি ঠাকুরকে। আর একটা বিষয়ের ভুল হয়ে যাচ্ছিল। তা হলো গুরুদেবের বিজ্ঞাপন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে তিনি এশিয়ান পেইন্টস থেকে টাটা স্টিল, ল্যাকমে আরও অনেক আইকনিক ব্রান্ডে যখন বিনা পারিশ্রমিকে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন তা কেবল স্বদেশি বাজারকেই চাঙ্গা করেনি, ঐক্যবদ্ধ করেছিল বাঙ্গালি সমাজকে। সতীশ চন্দ্রকে তিনিই বলেন বাঙ্গালি ব্যবসায় স্বাবলম্বী হোক না। সতীশ চন্দ্র বার্তা দিলেন নবগোপাল মৈত্রকে। তৈরি হলো সুলেখা কালি। ১৯৩৪-এ কালির বিজ্ঞাপনে রবি ঠাকুর নিজের হাতে লিখলেন, 'সুলেখা কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো।' রবি ঠাকুর ভারতীয় রেল থেকে শুরু করে গোদরেজ সাবান, রেডিমন ক্রিম, বোর্নভিটা, কুন্তলীন কেশ তেল, বাটা জুতো, ডেয়ারকিন হারমোনিয়াম, সমবায় বিমা, ছাপাখানা, ঘি, কাজল, এমনকী মস্তিষ্ক বিকৃতির রোগের মহৌষধিতেও বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। হরেক স্টাইলের। যার অধিকাংশই প্রকাশিত হয়েছে আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, দ্য স্টেটসম্যান, প্রবাসী, ক্যালকাটা গেজেট, তত্ত্ববোধিনী, এমনকী বিদেশে দ্য গার্ডিয়ান, দ্য গ্লোব-এও! কী হতো এই অর্থ? মূলত বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার অর্থ সংগ্রহ করেছেন এই পথে। বাঙ্গালিকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দিতে এমন যে ভিন্ন সত্তাও রবি ঠাকুর নেবেন তা সত্যিই অভাবনীয়।

হিমালয়সম রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব, রাষ্ট্রবোধ, বাঙ্গালিপ্রীতি তাঁর অখণ্ড বিশ্বচেতনা দেশপ্রেমের অবিচ্ছেদ্য অংশ। পৃথক পৃথক ভাবে তা পর্যালোচনার শক্তি এই নিবন্ধকারে নেই। রবীন্দ্র পূজন এক নিরবচ্ছিন্ন মন্ত্র, তা করতে করতে সমুদ্র থেকে যে ক'টি জলকণাসম উদাহরণ যোগে নিবন্ধ সৃষ্টির চেষ্টা হলো— তা স্বদেশি এবং বাঙ্গালি রবীন্দ্রনাথের মনন মনীষা অন্বেষণের এক আপ্রাণ প্রচেষ্টা। রবি ঠাকুরের এই সত্তাকে খোঁজার প্রচেষ্টা আবহমানকাল ধরে চলবে। এ কখনও নিবন্ধে আবদ্ধ হয় না।

রাজস্থানের জয়পুরে রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম

গত ৭,৮,৯ এপ্রিল রাজস্থানের রাজধানী শহর জয়পুরের কেশব বিদ্যাপীঠে স্বনির্ভর ভারত ও স্ব-আধারিত সমাজ গঠনের সংকল্প নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো রাষ্ট্রীয় সেবা সঙ্গম-২০২৩। সেবা সঙ্গমের উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সারা দেশের ৪৫টি প্রান্ত থেকে ৫১৫ জন মহিলা-সহ ২৭৫৬ জন প্রতিনিধি সেবা সঙ্গমে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়াও ব্যবস্থাপনায় ৯৫ জন মহিলা-সহ ৮২৯ জন প্রবন্ধক ছিলেন। উদ্বোধনী ভাষণে শ্রীভাগবত স্বনির্ভর ভারত এবং স্ব-আধারিত সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে স্বনির্ভর ভারত ও সমৃদ্ধ ভারতের ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ভারত তখনই বিশ্বগুরু হবে যখন আমাদের সমাজ পূর্ণ সম্ভাবনায় বিকশিত হবে, সুস্থ থাকবে। সেবা ও উৎসর্গের মাধ্যমে আমাদের অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যাতে সমাজের প্রতিটি অংশ শক্তিশালী হয়ে সমগ্র দেশ একটি ঐকবদ্ধ পরিবারে পরিণত হয়ে। এটি বাস্তবে পরিণত করতে সেবার ভাবনাকে জাতীয় মিশন করতে হবে। আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা এই লক্ষ্যে হওয়া উচিত।' সঙ্ঘ স্থাপনার পর থেকেই স্বয়ংসেবকরা কীভাবে সেবাকাজে নিবেদিত হয়েছেন তারও উল্লেখ করেন।

সেবা সঙ্গম পরিসরে একটি প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়। তাতে বিভিন্ন সেবা প্রতিষ্ঠান দ্বারা উৎপাদিত দ্রব্যাদি প্রদর্শন ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা ছিল। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বনির্ভরতা ও সামাজিক কাজের বিষয়ে সেবা সঙ্গমে আগত প্রতিনিধিদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন এবং সবাইকে অনুপ্রাণিত করেন। সেবা সঙ্গমের মূল মঞ্চে নারী ক্ষমতায়নের বিষয়ে ৫০টিরও বেশি প্রকল্প প্রদর্শিত হয়। এছাড়াও কেস স্টাডি, গবেষণাপত্র, পুস্তক এবং অন্যান্য প্রকাশনারও উপস্থাপনা করা হয়। অখিল ভারতীয় স্বাবলম্বন আয়ামের প্রমুখ বিনোদ বিড়লা বলেন, সেবা সঙ্গমে একে অপরকে অনুভব করার মাধ্যমে সেবার কী কী কাজ চলছে এবং কীভাবে সেবাকাজের আরও উন্নতি করা যায় সে বিষয়ে আলোচনা ও চিন্তন হয়েছে। রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর সহ অধ্যক্ষ অমিতা জৈন বলেন, সেবা সঙ্গমে প্রদর্শিত সফল প্রয়োগগুলি বিস্ময়করভাবে আগত প্রতিনিধিদের মনে প্রেরণা সঞ্চার করবে। বিগত ২৫ বছর ধরে রাষ্ট্রীয় সেবা ভারতীর কার্যকর্তা ও স্বেচ্ছাসেবকরা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও জীবিকার সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে বঞ্চিত, দুর্দশাগ্রস্ত, অবহেলিত ও অভাবী মানুষদের উন্নতির জন্য সারা দেশে ছোটো ছোটো গ্রামেও কাজ করে চলেছেন। 'নর সেবাই নারায়ণ সেবা'র ভিত্তিতে এই সেবা সঙ্গমে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ও সক্ষম ভারত গড়ার মঞ্চ গঠন করা হয়েছে। সেবা সঙ্গমে সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ দত্তাত্রেয় হোসবলে। তিনি বলেন, শক্তিশালী, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাপূর্ণ ভারতই বিশ্বশান্তির গ্যারান্টি। তিনি সেবা সঙ্গমে বর্ণিত ও প্রদর্শিত সফল প্রয়োগগুলিকে সর্বত্র প্রচারের আলোয় আনার আহ্বান জানান, কেননা সেবার উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে এই সফল প্রয়োগগুলো মানুষকে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করবে।

উল্লেখ্য, সেবা সঙ্গম পরিসর সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য ৬টি নগরে ভাগ করা হয়। সেবা সঙ্গম পরিদর্শন করেন পিরামল গ্রুপের অধ্যক্ষ অজয় পিরামল, রাষ্ট্রীয় সন্ত বালযোগী উমেশনাথ মহারাজ,বিশিষ্ট শিল্পপতি নরসেরাম কুলারিয়া, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য ভাইয়াজী যোশী, অখিল ভারতীয় সেবা প্রমুখ পরাগ অভ্যঙ্কর, সহ সেবা প্রমুখ রাজকুমার মেটালে, বিশ্বগুরু মহামণ্ডলেশ্বর পরমহংস স্বামী মহেশ্বরানন্দ, বিশ্ব জাগৃতি মিশনের আচার্য সুধাংশু মহারাজ, রাজসমন্দের সাংসদ দিয়া কুমারী, শিল্পপতি অশোক বাগলা প্রমুখ।

তেলিয়ামুড়ায় বিএমএসের কার্যালয়ের ভূমিপূজন অনুষ্ঠান

গত ২৩ এপ্রিল ত্রিপুরার তেলিয়ামুড়ায় ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের স্থায়ী কার্যালয় নির্মণের জন্য অম্পি চৌমুহানীতে ভূমিপূজার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের খোয়াই জেলা সেক্রেটারি তাপন কুমার দে, তেলিয়ামুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান রূপক কর, ভাইস চেয়ারম্যান মধুসূদন রায়, পৌর কাউন্সিলর নিশারানি সূত্রধর, শঙ্কর ঘোষ, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য, প্রদীপ ধর ও বিমল রক্ষিত। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা বিধান সভার সদস্য তথা উপাধ্যক্ষ কল্যাণী রায়, অখিল ভারতীয় প্রাইভেট ট্রান্সপোর্ট মজদুর মহাসঙ্ঘের সদস্য ও উত্তর-পূর্বঞ্চলের প্রভারি রাজু কুমার বণিক। পূজায় পুরোহিত হিসেবে ক্রিয়াদি সম্পন্ন করেন বিষ্ণু আচার্য।

সক্ষম, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকারিণী বৈঠক

গত ১৬ এপ্রিল সক্ষম, উত্তরবঙ্গ প্রান্তের কার্যকারিণী বৈঠক সম্পন্ন হয়। বৈঠকে ৯টি জেলা ও সিকিম থেকে ৪৩ জন কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উপস্থিত ছিলেন সংস্থার রাষ্ট্রীয় কার্যকারিণীর সদস্য সরোজ সাহু, সক্ষম উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সভাপতি তনয় কান্তি দাস,সম্পাদক

চন্দন রায়, সহ সম্পাদক আশিস দেব দাস, কোষাধ্যক্ষ প্রদীপ কুমার গুহ, জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি চঞ্চল লাহিড়ী , জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ, জেলা কোষাধ্যক্ষ সঞ্জয় মুখার্জি এবং যুব সম্পাদক শুভঙ্কর রায়। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত কুমার রায়।

ভারত সাধনা সমিতি, হাওড়ার উদ্যোগে আলোচনা সভা

'অতীতে বরাবরই এই বাঙ্গলার গৌরবের অনেক কিছুই ছিল, আজও অবশিষ্ট যা আছে তার ওপর ভিত্তি করেই এই রাজ্যকে শুধু ভারতেই নয়, দক্ষিণ-পূর্ব ওই এশিয়ার অগগণ্য বাণিজ্যিক কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলা সম্ভব'— গত ১৬ এপ্রিল হাওড়ায় ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন হলে ' পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতি ঃ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ' বিষেয়ে আলোচনা সভায় কথাগুলি বললেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ প্রসেনজিৎ কুমার বসু। পশ্চিমবঙ্গে প্রথম আইআইটি এবং আইআইএম স্থাপনের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তিনি বলেন, আজ আরও উন্নত মানের এধরনের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান গড়লে পশ্চিমবঙ্গ বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের পীঠস্থান হয়ে উঠতে পারে। সুলভ ও উন্নত চিকিৎসা পরিষেবার সুযোগ নিয়ে চিকিৎসা ও পর্যটনের ক্ষেত্রে ব্যাংককের আধিপত্যকে খর্ব করা যেতে পারে।

তিনি মনে করেন,কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জেরও অত্যাধুনিকীকরণ করে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করার যথেষ্ট সুযোগ আছে। পশ্চিমবঙ্গের জন্য তিনি শ্রমবহুল শিল্প প্রচারের পক্ষপাতী। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের পোশাক শিল্পের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেন তিনি।

উপস্থিত শ্রোতাদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন তিনি। সভায় সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি রথীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন দীপায়ন সান্যাল। ভারতমাতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ এবং শৌনক চক্রবর্তীর সংগীত দিয়ে সভার কাজ শুরু হয়।

সভা সঞ্চালনা করেন প্রণব রক্ষিত। তনুশ্রী মল্লিকের কণ্ঠে বন্দে মাতরম্ সংগীত দিয়ে সভার সমাপ্তি হয়।

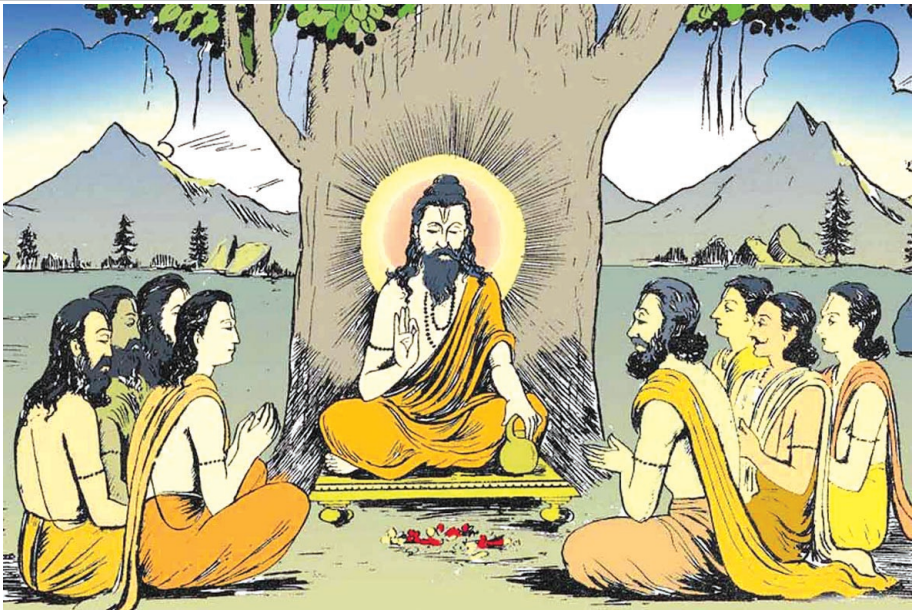

ধর্মজিজ্ঞাসা— নয়

সদাচারই পৌঁছে দেয় ধর্মের সিংহদুয়ারে

নন্দলাল ভট্টাচার্য

ধর্ম ও আচার। অনেকটা বর-বউয়ের মতো। অথবা বলা যায় খামের গায়ে ডাকটিকিট কিংবা লতা এবং যাকে জড়িয়ে বেড়ে ওঠে ওই ব্রততী, অনেকটা সেই রকম। সব ধর্মের ক্ষেত্রেই এটা প্রায় সমান সত্য। সনাতন ধর্ম বা হিন্দুধর্মের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আচারের সিঁড়ি বেয়েই ঢুকতে হয় ধর্মমন্দিরে।

হিন্দুধর্মে সে কারণেই আচারকে দেওয়া হয়েছে যথেষ্ট গুরুত্ব। মৃত্যু থেকে অমৃতপথের অভিযাত্রায় সে কারণেই কিছু আচার পালন প্রায় অপরিহার্য। মানব জীবনের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি বা ধর্মের যে শিখর— মোক্ষ যার নাম, সেখানে পৌঁছতে গেলে প্রাথমিক পর্বে কিছু আচার পালন আবশ্যিক। অনেকটা পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করার সময় বরফকাটা কুঠার অথবা বরফের দেওয়ালে খাঁজ কাটা বা দড়ির মইয়ের সাহায্য নেওয়ার মতোই ব্যাপারটা। তাই ধর্মের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য আচারনিষ্ঠ হওয়াটা খুবই জরুরি।

এ ব্যাপারে শাস্ত্র ব্যাখ্যাতাদের অভিমত, হিন্দু ধর্মের মূল নিহিত আছে বেদ বা শ্রুতিতে। অন্যদিকে আচারের উদ্ভবভূমি হলো স্মৃতি। বিভিন্ন স্মৃতি শাস্ত্রেই রয়েছে বিভিন্ন আচার এবং তা পালনের নির্দেশ।

আচার— ধর্মদর্শনে যাকে বলা হয় সদাচার, তার মধ্যেই রয়েছে 'আচার', 'আচরণ' ও 'চরিত্র'। মজার ব্যাপার হলো, এই তিনটি শব্দই নিষ্পন্ন হয়েছে 'চর্' ধাতু থেকে। 'চর্' ধাতুর সাধারণ অর্থ চলা। সোজা কথায় এই তিনের মধ্যে রয়েছে গতির আভাস, যা সাহায্য করে এগিয়ে চলতে এবং অবশ্যই শীর্ষে পৌঁছতে। আপাতদৃষ্টে আচার ও আচরণের প্রায় একই ধরনের অর্থ। কিন্তু প্রয়োগের দিক থেকে এ দুয়ের রয়েছে ভিন্ন ব্যঞ্জনা। সাধারণভাবে আচার বলতে বোঝায় কিছু রীতি নিয়ম বা ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপকে। অর্থাৎ এগুলো হলো জীবনযাপনের কিছু দিক্‌নির্দেশক। এই নির্দেশগুলিকে জীবনযাপনের ক্ষেত্রে যথাযথ প্রয়োগ এবং সেই অনুযায়ী এগিয়ে চলাটাই আচরণ। যিনি যে ভাবে এই আচারগুলি পালন করেন, তাঁর চরিত্রও সেই ভাবে বিকশিত হয়। সোজা কথায়, চরিত্র গঠনের অপরিহার্য উপাদান আচার ও আচরণ।

হিন্দুধর্মে পালনীয় আচারগুলিকে এক কথায় বলা হয় সদাচার। এই সদাচারের তালিকায় রয়েছে সত্য, অহিংসা, অদ্রোহ, ক্রোধশূন্যতা, সরলতা, অতিথি সেবা ইত্যাদি। অন্যদিকে এর বিরুদ্ধ বা বিপরীত পথ হলো কদাচার— যার মধ্যে রয়েছে দম্ভ, অভিমান, অশুচি, বিদ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ ইত্যাদি। সদাচারীরা হলো দৈবীভাব অথবা দৈবী সম্পদের অধিকারী। সেই অধিকারেই তাঁরা এগিয়ে চলেন স্বর্গ বা দেবত্বের পথে। অন্যদিকে কদাচারীরা আসুরী সম্পদের ভার নিয়ে হন নরকগামী।

এই যে সদাচার ও কদাচার, তার ফল কেবল মরজগতেই ভোগ করতে হয় না, এর রেশ টেনে নিয়ে যেতে হয় জন্মান্তরের ক্ষেত্রেও। অর্থাৎ সদাচারী তাঁর দৈবী সম্পদে ধনী হয়ে পরজন্মেও তাই বহন করে নিয়ে আরও উন্নতির পথে অগ্রসর হন। অন্যদিকে কদাচারীরা পরজন্মেও সেই কুফলের কারণেই এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধা পান। পরজন্মে সুপথ তাঁদের কাছে দুর্গম হয়ে ওঠে। পথের শেষে পৌঁছনো বেশিরভাগ সময়েই তাঁদের পক্ষে হয়ে ওঠে প্রায় অসম্ভব।

এ বিষয়টিই একটু বিশদে বলা হয়েছে বৃহদারণ্যক উপনিষদে। মিথিলায় জনকসভায় যাজ্ঞবল্ক্য আত্মার দেহত্যাগ, পুনর্জন্ম ও মুক্তি নিয়ে আলোচনার সময় (৪/৪/৩-৫) বলেন, একটা জোঁক যেমন একটা ঘাস থেকে অন্য একটা ঘাসে আশ্রয় নেয়, আত্মাও ওইভাবে এক দেহকে ত্যাগ করে অন্যদেহে আশ্রয় নেয়। পুরনো গয়না ভেঙে সেই সোনা দিকে স্বর্ণকার যেভাবে নানারকম গয়না বানিয়ে, অনেকটা সেভাবেই দেহত্যাগী আত্মার অবিদ্যা দূর করে বিভিন্ন জীবের উপযোগী একটি নতুন ও সুন্দরতর রূপ তৈরি করেন।

রাজা জনককে সেদিন যাজ্ঞবল্ক্য বলেন, এই যে আত্মা, ইনি বিজ্ঞানময়, মনোময়, প্রাণময়, তেজোময়, সর্বময়। এই আত্মাই ব্রহ্ম। চক্ষু, কর্ণ, পৃথিবী, জল, বায়ু, আকাশ, কাম, ক্রোধ, ধর্ম-অধর্ম— সব কিছুই ব্যাপ্ত এই আত্মায়। অর্থাৎ আত্মার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবকিছু। যা কিছু গঠিত হয় তার সবকিছুতেই রয়েছে এই আত্মার অবস্থান।

প্রশ্নটা ওঠে এইখানেই। আত্মাই যদি সর্বময়, আত্মাই যদি সৎ-অসৎ, ভালো-মন্দ ইত্যাদি সব কিছুর আশ্রয়, তাহলে সেই আত্মা যে শরীরেই প্রবিষ্ট হোক না কেন, সেই আত্মাযুক্ত জীবের তো একই রকম গুণ থাকা উচিত। কিন্তু বাস্তবে তো তা হয় না। এমনকী একই মায়ের গর্ভজাত সব ক'টি সন্তানও একই গুণের অধিকারী হন না। হন যে না, তা তো সকলেই জানেন এবং সেই জানাটা সত্যও। তাহলে কেন, কোনো কারণে মানুষে মানুষে এত পার্থক্য? কেন সব মানুষই একই গুণের অধিকারী নয়?

প্রশ্নটা অত্যন্ত কঠিন ও জটিল। কিন্তু এর উত্তরটা অনেকটাই জলবৎ। প্রাজ্ঞরা এমনই মনে করেন। যাজ্ঞবল্ক্যও সেদিন সেই কথাই বলেন। তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ 'যথাকারী যথাচারী তথা ভবতি সাধুকারী সাধুর্ভবতি পাপকারী পাপো ভবতি পুণ্যঃ পুণ্যেন কর্মনা ভবতি পাপঃ পাপেনেতি' —যে যেরকম কাজ করে, যে আচরণ করে, সে সেই রকমই হয়। শুভকর্ম করেছে যে সে হয় সাধু। আর পাপাচারী যারা তারা পাপী-ই হয়। সোজা কথা, পুণ্যকর্ম করলে জন্ম হয় পুণ্যবান রূপে। একই ভাবে পাপী হয় পাপ কাজ করারই ফলে।

আবার কেউ কেউ বলেন, যে যেরকম কামনা করে সে সেই রকমই সংকল্প করে সেই রকম কাজই করে। অর্থাৎ যেমন কর্ম— তেমনই ফল, এটাই প্রাজ্ঞ জনের কথা। আরও সহজ করে বললে বলতে হয়, মানুষের পেছনে সবচেয়ে সক্রিয় হলো কর্ম। এই যে কর্ম, তার সুফল ও কুফল তাকেই সাধারণ ভাবে বলা হয় পুণ্য ও পাপ। পাপ ও পুণ্যই প্রতি মুহূর্তে জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে মন্তব্য করেছেন আধ্যাত্মিক সম্পদে ধনী, প্রাজ্ঞ তাপসরা।

এরপরও ওঠে প্রশ্ন, পাপ-পুণ্যের ফল ভোগ করে মানুষ, একথা তো বোঝা গেল। কিন্তু কোনটা পুণ্য আর পাপই-বা কী? যদি পাপ-পুণ্যের সংজ্ঞাই জানা না থাকে তাহলে কেমন করে মানুষ বুঝবে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল?

এরই উত্তরে বলা হয়, নীতি শাস্ত্রে যে নীতির কথা বলা আছে তা লঙ্ঘন করাটাই পাপ। অন্যদিকে সমাজের কোনো নিয়ম ভাঙলে তা হবে অপরাধ। অপরাধের বিচার করেন সমাজপিতা বা প্রধানরা। অন্যদিকে পাপের বিচারক হলেন বিধাতা। ইহলোকে পাপের বিচার করা হয় স্মৃতি শাস্ত্রের নির্দেশ অনুযায়ী।

এর থেকে বোঝা যায়, ঈশ্বরের অনুগত থেকে অর্থাৎ বিশ্বাসে স্থির থেকে বিবেকসম্মত কাজই হলো পুণ্য। এর বিপ্রতীপে রয়েছে যেসব কর্ম তাকেই বলা হয় পাপ। অর্থাৎ পাপ ও পুণ্য— দুটি কাজের জন্যই দায়ী মানুষ। তার কারণ মানুষের আচরণ বা কর্মই হলো পাপ-পুণ্য বিচারের মাপকাঠি। কর্মপথ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে সঠিক পথটা দেখায় মানুষের বিবেক।

স্মৃতিশাস্ত্রের মতে, পাপ তিনরকম। মহাভারতেও ওই কথাই বলা হয়েছে। অনুশাসন পর্বে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম এক প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠিরকে বলেন, 'পরহিংসা, চুরি, পরনারী ভোগ— এই তিনটি হলো শারীরিক পাপ। অসৎ প্রলাপ, নিষ্ঠুর কথাবার্তা, পরনিন্দা বা পরচর্চা এবং মিথ্যে কথা বলা— এই চারটি হলো বাচিক পাপ এবং পরের জিনিসে লোভ, পরের অনিষ্টচিন্তা এবং বেদবাক্যে অশ্রদ্ধা এই তিনটি হলো মানসিক পাপ। মানুষ এই ধরনের পাপ না করলে ইহজীবন ও পরজীবনেও পুণ্য লাভ করতে পারবে। আর তাই কায়মনোবাক্যে অপরের অনিষ্টচিন্তা ছাড়তে পারলে সকলেরই ভালো হয়। জেনো, শুভ বা মঙ্গলজনক কাজ করলে সেই শুভফল এবং অন্যায় বা অশুভ কাজ করলে সেই অশুভ ফল ইহলোকেই ভোগ করতে হয়।' (ত্রয়োদশ অধ্যায়)

পাপের ধরন এবং চরিত্র অনুযায়ী পাপীদের আবার মহাপাতক, অনুপাতক ও উপপাতক— এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। মনুসংহিতায় এই তিন ধরনের পাপী ও পাপের কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে পাপস্খালনের জন্য কী করা দরকার তারও নির্দেশ আছে।

মনুর মতে, মহাপাপ হলো পাঁচটি (১১/৫৫)— যেমন, ব্রহ্ম হত্যা, সুরাপান, চুরি, গুরুপত্নী সংসর্গ এবং মহাপাতকদের সংস্পর্শে থাকা। মহাপাপের চেয়ে কিছুটা কম গুরুত্বের পাপ হলো অনুপাপ ও উপপাপ। এই অনুপাপ ও উপপাপের মধ্যে পার্থক্যটা খুবই কম। তার মধ্যে জাতের বড়াই করার জন্য মিথ্যাভাষণ, রাজার কাছে অন্যের মৃত্যু হতে পারে এমন কথা প্রকাশ, গুরু সম্পর্কে কল্পিত কথার প্রচারকারীকে চিহ্নিত করা হয়েছে অনুপাতক (মনুঃ ১১/৫৬) হিসেবে।

সোনা ছাড়া অন্য কিছু চুরি করা, দেব-পিতৃ-ঋষিঋণ শোধ না করা, শ্রুতি-স্মৃতি বিরুদ্ধ অসৎ শাস্ত্রের চর্চা, পশু চুরি, স্ত্রী হত্যা, নাস্তিকতা ইত্যাদি হলো উপপাপ এবং এই পাপ যারা করে তারা হলো উপপাপী (মনুঃ ১১/৬০-৬৭)।

সুস্থ, সুন্দর জীবনযাপনের মাধ্যমে ইহলোকে সুখ ও শান্তি উপভোগ করার এই পথের কথা নানাভাবে বলা হয়েছে হিন্দু শাস্ত্রগুলিতে। এই ভাবে জীবনযাপনের ফল যে পরলোকেও পাওয়া যাবে তাও বলা হয়েছে বারবার। এতসব বলা থাকলেও মানুষ কিন্তু সব সময় তা অনুসরণ করে না। যদি করত তাহলে এই মরলোকই হতো অমরালোক বা স্বর্গ। এই ক্ষেত্রে মানুষ যেন কিছুটা জ্ঞানপাপী— জেনেও মানে না তা। পুরো ব্যাপারটা সকলের মতো অর্জুনের কাছেও ছিল এক বিস্ময়। তাই শ্রীকৃষ্ণের কাছে তিনি জানতে চান, কেন এমন হয়? কেন মানুষ সব জেনেও করে একই ভুল? কেন হয় এমনটা?

উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলেন, বাসনার জন্যই মানুষ নানা ভুল পথে যায়। বাসনামুক্ত হতে না পারলে মানুষের পক্ষে মুক্তি পাওয়ার মতো কাজ করাটা খুবই মুশকিল।

এই প্রসঙ্গেই বলা হয়, পুণ্যই হোক অথবা পাপই হোক, সবের মূলেই রয়েছে কর্ম। কর্ম করতে হয় সকলকেই। কিন্তু শ্রুতি বা বেদ নির্দিষ্ট কর্ম না করে যারা আপাতসুখের আশায় অসৎ কর্ম করে তারাই পরিণামে অশেষ দুঃখের ভাগী হয়। তবে এই কর্মের মূলেও আবার

রয়েছে বিগত জন্মের কর্মের ফল। সেই ফলই মানুষকে ইহজন্মে তার পছন্দ মতো পথে চলতে কার্যত বাধ্য করে। শাস্ত্রবাক্য মেনে, গুরুনির্দেশিত বা মহাজনের পথ চলাটাই ধর্মের পথ। কিন্তু নানা কারণেই মানুষ সব সময় সেই পথে চলে না, এটাই জীবনের সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা বা ট্র্যাজেডি।

সব জেনেও মানুষ অনেকসময় মনে করে, নিভৃতে যে অন্যায় কাজ করা হচ্ছে, তার তো কোনো সাক্ষী নেই। নেই কোনো প্রত্যক্ষ দর্শী, তাহলে ওই কাজের ফলভোগ করার কোনো সম্ভাবনাই তো থাকে না। এই চিন্তাটাই ভুল পথে চালিত করে মানুষকে। মানুষ বহু সময়ই ভুলে যায় যে, সদাজাগ্রত দ্রষ্টা একজন রয়েছেন, তাঁকে অন্ধকারে রেখে কোনো কাজই কেউ করতে পারে না।

মহাভারতের আদিপর্বে আছে, মানুষের জন্ম থেকে প্রতিটি কর্মের দ্রষ্টা বা সাক্ষী রয়েছেন চোদ্দজন। যখন যে অবস্থায় মানুষ যে কর্মই করুক না কেন, এই চোদ্দজন দ্রষ্টার দৃষ্টি এড়িয়ে কিছুই করা যায় না। সব কাজের দ্রষ্টা এই চোদ্দজন হলেন, (১) সূর্য, (২) চন্দ্র, (৩) বায়ু, (৪) অগ্নি, (৫) আকাশ, (৬) পৃথিবী, (৭) জল, (৮) দিন, (৯) রাত্রি, (১০) ঊষা, (১১) সন্ধ্যা, (১২) ধর্ম, (১৩) কাল ও (১৪) পরমাত্মা।

এসব থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়, মানুষ মাত্রকেই কর্ম করতে হয়। ভালো-মন্দ যে কর্মই করা হোক, তার সব কিছুরই একজন দ্রষ্টা রয়েছেন। কেবল তাই নয়, কর্ম অনুসারেই মানুষের ভাগ্য বা নিয়তি নির্দিষ্ট হয়। শাস্ত্রকাররা বলেন, হিংসাদ্বেষ শূন্য হয়ে, ধৃতি, ক্ষমা, দম ইত্যাদি ধর্মানুসারে জীবনযাপন করাটাই হলো পুণ্যকাজ। এই পুণ্যকাজ করেন যেসব পুণ্যবান তাঁরা ওই পুণ্যের বিত্তেই স্বর্গে যান। এই স্বর্গেই থাকেন দেব-দেবীরা। থাকেন দেবতাদের রাজা ইন্দ্র তাঁর বৈজয়ন্ত প্রাসাদে। স্বর্গের রাজধানীর নাম অমরাবতী। সেখানে আছে মনোরম উদ্যান নন্দনকানন। আছে স্বর্গনদী মন্দাকিনী। নিত্য আনন্দ বিরাজমান এই স্বর্গে।

আপন পুণ্যে যাঁরা স্বর্গবাসী হন, তাঁরা কিন্তু চিরকাল স্বর্গে থাকতে পারেন না। পুণ্যের সঞ্চয় ফুরিয়ে গেলেই তাঁদের আবার জন্ম নিতে হয়। তপস্যার বলে মানুষ যখন ব্রহ্মের সাযুজ্য লাভ করে, তখনই হয় মোক্ষ সেই ব্রহ্মজ্ঞানীর।

আর যাঁরা বিপরীত কাজ করেন অর্থাৎ পাপের পর পাপ করে যান তাঁদের সঞ্চয় তখন দাঁড়ায় শূন্যে। নিজেদের পাপকাজের জন্যই সেইসব পাপী মানুষের ঠাঁই হয় নরকে। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুযায়ী নরক কিন্তু একটি বা একরকম নয়। পুরাণমতে নরকের সংখ্যা ৮৬টি। পাপী তার পাপের পরিমাণ অনুযায়ী ওইসব নরকে অশেষ দুঃখ যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে জীবন কাটায়। নরকভোগ শেষে কর্মঅনুযায়ী সেই পাপীর আবার জন্ম হয়। তখন যদি সেই মানুষ সদাচারী হয়, তাহলে তার ভাগ্য হয় সুপ্রসন্ন। সঞ্চয় হতে থাকে পুণ্য। এবং ক্রম তপস্যায় সেই মানুষও একদিন পান স্বর্গবাসের অধিকার। ক্রমিক তপস্যার মধ্য দিয়ে অর্জন করেন ব্রহ্মজ্ঞান এবং একসময় লাভ করেন মোক্ষও।

তাহলে দেখা যাচ্ছে গুণ ও কর্মের চাকায় বাঁধা মানুষের জীবন। গুণ ও কর্ম অনুসারেই হয় সব কিছু। এই মরলোকের মানুষ এক্ষেত্রে কিছুটা অসহায়। কিন্তু তমোগুণের অন্ধ নেশায় মানুষ নিজেকেই মনে করে যন্ত্রী। যন্ত্রের এই অহমিকা বা অস্মিতাবোধই তাকে টেনে নিয়ে যায় অসৎ কর্মের পথে।

ধ্রুবতারার মতোই ধর্মও মানবজীবনের দিগ্‌নির্দেশক। আকাশের ওই তারার মতোই ধর্ম স্থির, শাশ্বত, সনাতন। এবং সর্বকালের ও যুগের একমাত্র সত্য। কিন্তু আচারের ক্ষেত্রে এই কথাটি খাটে না। যুগ ধর্ম অথবা সামাজিক প্রয়োজনেই আচারের রদবদল হতে পারে।

খাবার নিয়েই শুরু করা যেতে পারে। এক দেশে যেটা অভ্যক্ষ অর্থাৎ যেটি খাওয়ার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, অন্য দেশে বা ঋতুভেদে এবং আপৎকালে বা আকাল ঘটলে সেই খাদ্যই আবার খাওয়া যেতে পারে। এটা কেবল ধর্মভেদে নয়, একই ধর্মের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

বৈদিক যুগ থেকেই হিন্দুধর্মে প্রাধান্য পেয়েছে নানা যাগযজ্ঞ। সাধারণ গৃহস্থ অথবা তপস্বীরাই কেবল যাগযজ্ঞ করতেন না, রাজারাও এ ব্যাপারে যথেষ্ট এগিয়ে ছিলেন। রাজসূয় থেকে বিভিন্ন ধরনের যজ্ঞ করতেন তাঁরা ধর্ম পালনের জন্য, নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য। রাজারা যেসব যজ্ঞ করতেন তার অন্যতম ছিল অশ্বমেধ যজ্ঞ। কিন্তু যুগের প্রভাবে সেই যজ্ঞকেই নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়। বিভিন্ন পুরাণের নির্দেশ কলিযুগে অশ্বমেধ যজ্ঞ করা যাবে না বা করা উচিত নয়।

হিন্দুধর্মে আচারের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে যদি ফিরে আলোচনা করতে হয়, অবশ্যই সংক্ষেপে, তাহলে স্বীকার করতেই হবে আচার ধর্মপালনের অবশ্যই একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়। আচার ও আচরণ যদি সৎ-সুন্দর, শোভন ও শুচিময় না হয় তাহলে ধর্মের দুয়ারটি খোলাই কঠিন। ধার্মিক যাঁরা, ধর্মকে যাঁরা আন্তরিকভাবে জীবনে প্রতিফলিত করতে চান অবশ্যই তাঁদের সদাচারী হতে হবে। তার অবশ্য এই নয় যে আচারবান মাত্রই ধর্মজ্ঞ অথবা ধর্মের পথে সিদ্ধিলাভ করেছেন অথবা করবেন তাঁরা। সিদ্ধিলাভ করতে গেলে আচার পালনের সঙ্গে সঙ্গে তপস্যাও করতে হবে। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্বটি অনুধাবন করে ক্রমোন্নতির দিকে অগ্রসর হতে হবে।

অন্যদিকে, আচারকেই ধর্ম মনে করে আচারের গোলোকধাঁধায় যাঁরা ঘুরপাক খান, প্রতি পদে আচারকে কঠোর ভাবে পালন করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তাঁরা এক ধরনের মানসিক বৈকল্যের শিকার হন। শুচিবাইগ্রস্ত বলে সকলে তাঁদের এড়িয়ে চলতে চান। তাঁরাও ধর্মের মূল তত্ত্বগুলি ভুলে তীব্রভাবে আচারকে আঁকড়ে ধরতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত শ্যাম ও কুল দুই-ই হারান।

এ কারণেই শাস্ত্রকার ও ধর্মবেত্তারা বলেন, ধর্মের উদ্দেশ্য আচার-অনুষ্ঠানের অনেক উর্ধ্বে। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে আচারের পরিবর্তন হতে পারে কিন্তু ধর্ম শাশ্বত, কিছু বিকারহীন নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। একারণেই মনুসংহিতাকার বলেছেন, 'বেদ অখিল ধর্মমূলম্' (২/৬) বেদই সমগ্র ধর্মের মূল। জ্ঞাননেত্র দিয়ে সমস্ত শাস্ত্র পর্যালোচনা করে, শ্রুতির প্রামাণ্য বুঝে ধর্মের অনুষ্ঠান করেন বিদ্বান ধর্মজ্ঞ ব্যক্তিরা (২/৯)। আর এই ভাবেই ধর্মকে অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত গভীরতর তপস্যা ও নিষ্ঠার মাধ্যমে মানুষ মোক্ষলাভ করে। আত্মা মিলে যায় পরমাত্মায়। □

মানুষের দৃঢ় মেলবন্ধন
ত্রিপুরায় গড়িয়া পূজা

সেন্টু রঞ্জন চক্রবর্তী

উৎসবের রাজ্য ত্রিপুরায় প্রতি বছরের মতো এ বছরও রাজ্যজুড়ে সনাতন জনজাতি সমাজের মানুষের অন্যতম বড়ো উৎসব গড়িয়া পূজা মহাসমারোহে উদ্‌যাপিত হয়েছে। আগরতলা ক্ষুদিরাম বসু ইংরেজি মিডিয়াম স্কুলে অন্যান্য বছরের মতো এবারও মহাসমারোহে গড়িয়া পূজার আয়োজন করা হয়। এই উপলক্ষ্যে সেখানে জলছত্রের আয়োজন করা হয়েছিল। ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ স্কুল মাঠে পুণ্যার্থীদের জলপানের সুবন্দোবস্ত ছিল। তীব্র গরমের মধ্যেও ভক্তের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। সর্বস্তরের মানুষের জন্য স্কুল মাঠে মেলার আয়োজন ছিল অন্যতম আকর্ষণ। বিনামূল্যে স্বাস্থ্যসেবা, রক্তদান শিবির এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ত্রিপুরা সনাতনী সমাজ এই অনুষ্ঠানকে সার্থক করে তোলেন।

রাজ্যের সর্বত্র ধর্মনগর, কৈলাশহর, কুমারঘাট, কাঞ্চনপুর, মাছমারা, মনু, চৈলেংটা, তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, জিরানিয়া, মোহনপুর, বিশালগড়, উদয়পুর, শান্তিরবাজার, অমরপুর, বীররচন্দ্রমণু, বেলোনিয়া, দশদা, সাব্রুম-সহ সর্বত্রই গড়িয়া পূজা হয়েছে। এ বারের পূজায় জাতি উপজাতির মধ্যে মেলবন্ধনের ভাব অনেকটাই স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়েছে।

গড়িয়া পূজার রীতিনীতি অনেকটাই অন্যসব পূজা থেকে ভিন্ন। পূজার পুরোহিতকে বলা হয় চন্তাই। বৈশাখ মাসের প্রথম দিন থেকে গড়িয়া দেবতাকে নিয়ে গ্রামের প্রতিটি বাড়ি পরিক্রমা করেন ভক্তেরা। এটা এই পূজার প্রাক রীতি। গড়িয়া দেবতা বাড়িতে আসছেন দেখতে পেলে বাড়ির মহিলারা উঠানে জল ছিটিয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে একটি পিঁড়ি বসান। গড়িয়া মূর্তিকে ওই পিঁড়িতে বসানো হয়। এরপর পরিবারের কর্তা, গৃহিণী-সহ পরিবারের সব সদস্য ধূপ দীপ দেখিয়ে গড়িয়াকে বরণ করে প্রণাম করেন। একইসঙ্গে চাল-সহ উৎপাদিত ফসল ও নগদ টাকা অনুদান হিসেবে দেবতার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়ে থাকে। দেবতাকে উঠানে পিঁড়িতে বসানোর পরিক্রমার সঙ্গে আসা নারী-পুরুষ বাবা গড়িয়াকে ঘিরে নানা গান গাইতে গাইতে নৃত্য করেন। একইভাবে পয়লা বৈশাখ থেকে সাতদিন পর্যন্ত এক গ্রাম থেকে অন্য গ্রামে পরিক্রমা অব্যাহত থাকে।

হিন্দুদের অন্য সব দেবতার মূর্তি থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বাবা গড়িয়ার মূর্তি। গড়িয়া মূর্তি তৈরি হয় বাঁশ, জনজাতিদের হস্তচালিত তাঁতে তৈরি কাপড় দিয়ে। ব্যবহার করা হয় জুমের চালও। গড়িয়া পূজার মণ্ডপও তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। পূজায় মুরগি, কবুতর ও পাঁঠাবলি দেওয়ার প্রথাও চালু আছে। আবার কেউ কেউ কবুতর বলি না দিয়ে গড়িয়ার কাছে উৎসর্গ করে ছেড়ে দেন।

মূলত গ্রামের সকল মানুষের মঙ্গল কামনা এবং জুম চাষে অধিক ফলনের আশায় গড়িয়া দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে যুগ যুগ ধরে ত্রিপুরার সনাতন জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ এই পূজা করে আসছেন। যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পূজাতেও নানা পরিবর্তন এসেছে। এখন আগরতলার বিভিন্ন পাড়ার লোকজন এমনকী ক্লাবের উদ্যোগেও গড়িয়া পূজার আয়োজন করা হয়। এখন এই পূজা অনেকটাই সর্বজনীন রূপ নিতে চলেছে।

রাজধানী আগরতলার অভয়নগর এলাকায় সবচেয়ে বড়ো গড়িয়া পূজা হয়। বসে মেলাও। জনজাতি সমাজের মানুষ অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে এই পূজা করে থাকেন। তবে কবে থেকে এই পূজার সূচনা তা নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানা যায়নি। মানুষের ধারণা, যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে এই পূজা হয়ে আসছে। এই পূজা অনেক প্রাচীন। জানা যায় রাজাদের আমল থেকে এখানে গড়িয়া পূজা হয়ে আসছে।

স্থানীয় প্রথা অনুযায়ী, প্রতিটি গ্রামের অল্প বয়সি ছেলে-মেয়েরা দল বেঁধে গ্রামে গ্রামে নাচতে নাচতে ঘুরে বেড়ায়। নিজ গ্রামে এটি শেষ করার পরে তারা অন্য গ্রামের দিকে চলে যায় এবং এই প্রক্রিয়াটি সাতদিন ধরে চলতে থাকে। এই দলগুলি প্রভু গড়িয়ার একটি প্রতীকও বহন করে। একটি দীর্ঘ সজ্জিত বাঁশের খুঁটি যা গড়িয়া প্রভুকে প্রতীকীভাবে চিত্রিত করে। এই খুঁটি বাড়ির উঠানের মাঝখানে স্থাপন করে ধর্মীয় স্তোত্র উচ্চারণ করা হয়ে থাকে।

পূজা অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পরে জনজাতি লোকজ নৃত্য পরিবেশিত হয়। জনজাতি ভক্তরাই এসব অনুষ্ঠানের প্রধান অংশগ্রহণকারী। এছাড়া সুসজ্জিত কার্নিভালও অনুষ্ঠিত হয়। কার্নিভালে স্থানীয় লোক সংস্কৃতি অনুষ্ঠানকে ভিন্ন মাত্রা দিয়ে থাকে। □

রাজনীতির কদর্য রূপ রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েছিলেন ঘরে-বাইরে উপন্যাসে

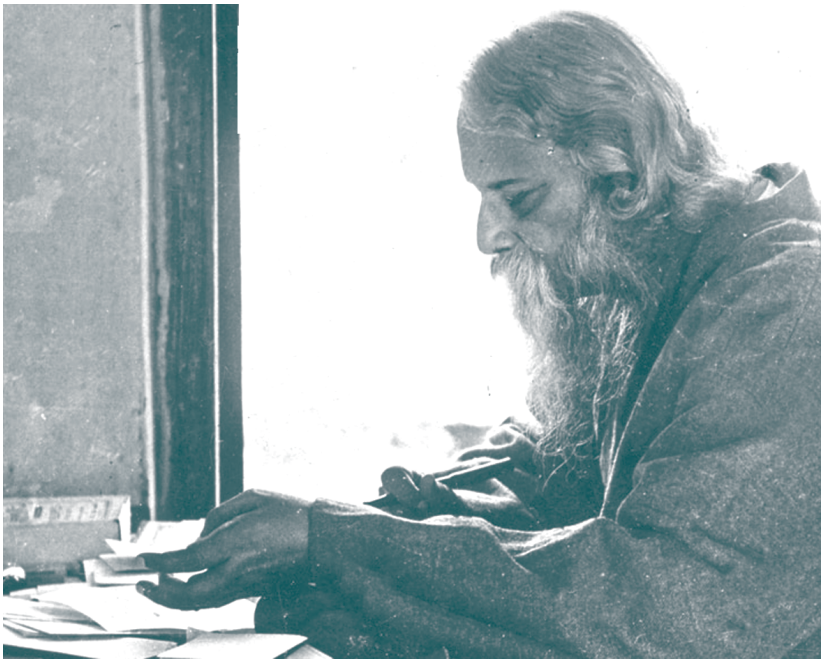

ড. জয়ন্ত কুশারী

'শাসনে যতই ঘেরো/আছে বল দুর্বলেরও/হও না যতই বড়ো আছেন ভগবান।/আমাদের শক্তি মেরে তোরা ও বাঁচবি নে রে,/বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান...।'

দ্ব্যর্থহীন ভাষায় হুঁশিয়ারি। হুঁশিয়ারি দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বৈরাচারী কলুষিত প্রশাসনকে আর ভ্রষ্টাচারী নেতাকে এই হুঁশিয়ারি। তিনি রাজনীতি সচেতক এবং আপোশহীন। তাই কুণ্ঠাবোধ করলেন না দ্ব্যর্থহীন ভাষা ব্যবহারে। এমনটাই দস্তুর স্বৈরাচারী কলুষিত শাসককে আর ভ্রষ্টাচারী নেতাকে হুঁশিয়ারি দিতে। শুধুমাত্র বাক্‌স্বাধীনতার প্রয়োগ। তুলে নেননি আইন ও শাসনকে নিজের হাতে। ভাষা মার্জিত হলেও তার তীব্রতা নিয়ে কোনো কথা হবে না। সমানভাবে গর্জে উঠেছেন তথাকথিত নেতার বিরুদ্ধে। যিনি কেবল মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন। আদতে ঠগ। বাকচাতুর্যে। দেহের ভাষায়। চলনে বলনে। আচার-আচরণে। এক কথায় বহিরঙ্গে আকৃষ্ট করে দেশের মানুষকে। দেশের জন্য সংগ্রামের আড়ালে লুকিয়ে ছিল সন্দীপের কপটতা। স্বদেশির বুলি আওড়াতে আওড়াতে অথবা মুখে বন্দেমাতরম্ বলে বলে সে ঠোঁটে দামি সিগারেট ঝোলাতে অথবা ট্রেনের ফার্স্টক্লাসে ভ্রমণ করতে কুণ্ঠিতবোধ করে না।

বিমলার মতো পর্দানসীন নারীকে তাঁর চরিত্রের ম্যাগনেটিজম্ দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার শক্তি তাঁর ছিল। উদারমনা নিখিলেশ চেয়েছিলেন— আমি চাই বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও, আমি তোমাকে পাই। স্বামীর উৎসাহে সামাজিক বিধিনিষেধ অবজ্ঞা করে, প্রচলিত প্রথা ভেঙে বিমলা মুখোমুখি হয়েছিলেন ঝড়ের দমকা হাওয়ার মতো স্বদেশি আন্দোলনের তথাকথিত নেতা সন্দীপের। বিমলার ভেতর সন্দীপ দেশের জাগ্রত শক্তিকে প্রত্যক্ষ করেছে বলে দাবি করেছে। আর যে বিমলা ছিল গ্রামের ছোটো নদী তার বুকে ডেকে গেল সমুদ্রের বান। মৌচাকের মক্ষিরানি সম্বোধনে সে নিজেকে নতুন করে আবিষ্কারের খেলায় মেতে উঠলো। যে সুন্দরী ছিল না সে সুন্দরী হয়ে উঠলো। যে ছিল সামান্য সে নিজের মধ্যে সমগ্র বাঙ্গলার গৌরবকে প্রত্যক্ষ অনুভব করলো। ঘরে বাইরে উপন্যাসে স্বদেশি আন্দোলনের অন্ধকার দিকের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। যার প্রতীক নিশ্চিতভাবে সন্দীপ। নিখিলেশ ও বিমলার দাম্পত্য জীবনকে কালো ছায়ায় আচ্ছাদিত করলো এই লোলুপ, ভণ্ড, প্রতারক সন্দীপ। স্বদেশি আন্দোলনের নামে যে প্রলয়ংকরী ধ্বংসযজ্ঞ শুরু হয়েছে তা স্পর্শ করেছে বিমলাকে।

ঘরে বাইরে উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়িত রূপ।

সন্দীপের 'আজকের দিনে আমাদের মেয়েরাই আমাদের দেশকে বাঁচাবে' জাতীয় কথাবার্তায় বিমুগ্ধ বিমলা ভুলে গেল যে, স্বামী নিখিলেশের স্বদেশি ব্যাংক, স্বদেশি জাহাজের ব্যবসা, স্বদেশি কলম, স্বদেশি সাবান ব্যবহারের চেষ্টাকে কখনও সে ভালো চোখে দেখেনি। তাই নিখিলেশের মনে হওয়া

সঙ্গত ছিল যে, 'আজ একথা আমি স্পষ্ট বুঝেছি, বিমলার জীবনে আকস্মিকমাত্র, বিমলার সমস্ত প্রকৃতি যার সঙ্গে সত্য মিলতে পারে সে হচ্ছে সন্দীপ। সন্দীপের আরও দুজন নারীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের ইঙ্গিত তার আত্মকথনে রয়েছে। যে কোনো নারীকে আকর্ষণ করার মতো সম্মোহনী ক্ষমতা তাঁর মধ্যে রয়েছে এবং তার মতে— 'যা আমি কেড়ে নিতে পারি সেইটাই যথার্থ আমার, এই হলো সমস্ত জগতের শিক্ষা।' সেই স্বদেশি আন্দোলনের মুখোশের আড়ালে বিমলার মন ভুলিয়ে নিজের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার সব আয়োজন সম্পন্ন করেছিল সন্দীপ।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৬ সালে 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস রচনা করেন মূলত স্বদেশি আন্দোলনকে উপজীব্য করে। কিন্তু আজ এই একবিংশ শতাব্দীর দু'দশক জুড়েও তাঁর সন্দীপেরা সমানভাবে সমাজকে কলুষিত করে চলেছে। প্রতিদিন প্রতিনিয়ত এই সন্দীপের দল দাপিয়ে বেড়াচ্ছে সমানভাবে। যা ছিল তাঁর কালেও বৈপ্লবিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে নিখিলেশ-বিমলা, সন্দীপের অনিয়ন্ত্রিত টানাপোড়েন নিয়ে রচিত ভিন্নধর্মী এক রাজনৈতিক উপন্যাস। তবে ঘরে বাইরে উপন্যাসের প্রধান চরিত্র বিমলার চরিত্র চিত্রণে যে গভীর মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সম্পর্কের টানাপোড়েন চিত্রিত হয়েছে তা অন্য চরিত্রগুলোকে ছাপিয়ে গেছে।

নিখিলেশ বিমলার কল্পনার রাজপুত্র রূপে ধরা না দিলেও শত বছরের লালিত বাঙ্গালি সংস্কারে আচ্ছন্ন বিমলা স্বামীকে প্রেমের অর্ঘ্য নিবেদন করে পুজো করতে দ্বিধা করেননি। রাজবাড়ির বধূ হিসেবে তাঁর সামাজিক অবস্থান চিহ্নিত হয়েছে ঘরে বাইরে উপন্যাসের পরতে পরতে। আধুনিক মনের মানুষ নিখিলেশ স্ত্রীকে পরিধান করিয়েছেন আধুনিক পোশাক এবং তাঁকে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করতে ছিলেন বদ্ধপরিকর। মত প্রকাশের স্বাধীনতা প্রাপ্তি ছিল বিমলার ব্যক্তিত্ব বিকাশের একটি উল্লেখযোগ্য ধাপ। নিখিলেশের কথায়— বিশ্বের মধ্যে জ্ঞানে, শক্তিতে, প্রেমে পুনর্বিকাশিতা বিমলাকে দেখার বড়ো ইচ্ছা ছিল। স্বামীর আন্তরিক ইচ্ছায় সে ঘরের সীমাবদ্ধ পরিসর থেকে বাইরের বিস্তৃত জগতে পদচিহ্ন রেখেছিল। তাঁর ধারণা ছিল আশপাশের মানুষের আচার-আচরণ সম্পর্কে নিখিলেশের অজ্ঞতাই ছিল তাঁর সরলতার প্রধান কারণ। সে সব মানুষের মধ্যে সর্বাগ্রে ছিল তাঁর বড়ো জা, মেজ জা ও সন্দীপ। স্বামীকে সচেতন করার ব্যর্থ চেষ্টায় সে কখনও কখনও মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়েছে কিন্তু নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে স্বামীর কাছ থেকে।

সন্দীপ এমনই এক তথাকথিত নেতা। 'ঘরে বাইরে' রবীন্দ্রনাথের একটি কালজয়ী রাজনৈতিক উপন্যাস। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিতে যার জুড়ি মেলা ভার। যে প্রতিশ্রুতি নেতারা কোনোদিনই পালন করেন না। জনসমাবেশে দেশের জন্য স্বার্থ ত্যাগ করতে বলেন সমবেত জনসাধারণকে। কিন্তু নিজে নিজের শরীরের বর্জ্য পদার্থ ছাড়া অন্য কিছু ত্যাগ করেন না। আপাদমস্তক সৌখিন এক মানুষ। বিলাতি জিনিসই ব্যবহার করেন তিনি। কিন্তু দেশের মানুষকে বলেন বিলাতি জিনিস বর্জন করতে। আবার চরিত্রের দোষও তাঁর পুরোদস্তুর। এহেন অকৃতদার জড়িয়ে পড়লেন অবৈধ সম্পর্কে। আদর্শবাদী বন্ধু নিখিলেশের স্ত্রী পর্দানসীন বিমলার সঙ্গে। তারপর ব্যক্তিস্বার্থ চরিতার্থ করলেন। জনরোষ তাঁর ওপর উগরে পড়ার আগে লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেলেন। পরে তাঁর বন্ধু নিখিলেশ, বন্ধুর স্ত্রী বিমলা, তাঁর অনুগামী এবং দেশবাসী তাঁর স্বরূপ বুঝতে পারে। ততক্ষণে সংশ্লিষ্ট সকলের যা ক্ষতি হওয়ার হয়ে গেছে। এমন একটি চরিত্র হাজির করে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জ্ঞানচক্ষু খুলে দিলেন। সতর্ক করলেন আমাদের যাতে আমরা কোনোভাবেই এঁদের কথার জালে জড়িয়ে না পড়ি। এর থেকে বড়ো প্রতিবাদ আর কী হতে পারে।

অথচ রবীন্দ্রনাথ তো হলেন একজন কবি, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, গীতিকার, সুরকার, ছোটো গল্পকার, আরও কত কী তার ইয়ত্তা করা যাবে না। তিনি এহেন সত্তাগুলি নিয়ে পাহাড়-পর্বতের গুহায় চলে যাননি। অথবা অরণ্যের গভীরে কুটির নির্মাণ করে জগৎ বিচ্ছিন্ন, মানব বিচ্ছিন্ন, সমাজ বিচ্ছিন্ন সৃষ্টিমগ্ন সাধনার আসন বিছিয়ে বসেননি। সৃষ্টিশীল কাজের সঙ্গে একজন রাজনীতি সচেতকের ভূমিকা পালন করলেন পুরোদস্তুর। একথা এখন এখানেই থাক। এখন রাজনীতি সচেতনতার প্রেক্ষাপটটি দেখে নেওয়া যাক।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দকে বাদ দিলে রবীন্দ্রনাথই অন্যতম মহামানব যিনি ভাবীকালের পৃথিবীকে তাঁর অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে চিনতে পেরেছিলেন। এটি অনস্বীকার্য যে, বিবাদ বিদীর্ণ দেশ রাজনৈতিক মতাদর্শের বৈষম্য, অর্থনৈতিক স্তরবিন্যাসের বৈচিত্র্য, প্রগতির বিভিন্ন মানকে স্বীকার করে নিয়েও সামাজিক ক্রমোন্নতির পথ থেকে বিচ্যুত হয়নি। বৈষম্যের মধ্যে সাম্য। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের অন্তর্লীন প্রয়াস মানব সভ্যতাকে আজও এগিয়ে রেখেছে। সভ্যতার বিচিত্র ধারার মধ্যে এই অন্তঃসলিলা মূল স্রোতটির কলধ্বনি শুনতে পান একালের ক্রান্তদর্শী ঋষি রবীন্দ্রনাথ।

রবীন্দ্রনাথ দেশের সার্বিক সমস্যার প্রাণসম্পদনটি অনুভব করলেন। তাঁর অনুভবে একক মানব চরিত্র পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদের ক্ষুদ্রতম প্রকাশ। যখন পরিবারের সকল সদস্যই চরিত্রবান হন, তখনই একটি আদর্শ স্থানীয় চরিত্র তৈরি হয়। আজকাল 'গুড গভর্নেন্স' কথাটি খুবই প্রচলিত। যার অর্থ হলো সুশাসন। শাসনের দুটি দিক। একটি তাত্ত্বিক দিক। অপরদিকে তত্ত্বের রূপদানের আজ্ঞাবাহী কয়েকজন রূপকার। সমাজে কল্যাণমুখী তত্ত্বের অভাব নেই। অভাব আসল লোককল্যাণে নিবেদিত প্রাণের।

এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ আমাদের দেখিয়ে দিলেন আদর্শ নাগরিক এবং আদর্শ শাসকের ঠিক কেমন হওয়া উচিত। যাতে উভয়েই আদর্শ আচরণবিধি লঙ্ঘন না করেন। রাজনীতি সচেতক রবীন্দ্রনাথ তা আমাদের জানালেন তাঁর গানের মাধ্যমে। 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে/নইলে মোরা রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?/আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তার খুশিতেই চরি।/আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে—/নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?/রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান।/মোদের খাটো করে রাখেনি কেউ কোনো অসত্যে—/ নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?/ আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে,/মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে-- /নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?

(লেখক সর্বভারতীয় প্রাচ্যবিদ্যা আকাদেমির অধ্যক্ষ)

তথ্যসূত্র : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ঘরে বাইরে উপন্যাস।

মাত্রাতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি দেশের উন্নতির পরিপন্থী

দিগন্ত চক্রবর্তী

জনসংখ্যার নিরিখে চীনকে ছাড়িয়ে বিশ্বের প্রথম স্থানে উঠে এলো ভারত। সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জের তরফ থেকে বিশ্বের জনবহুল দেশগুলির একটি তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, আর তাতেই দেখা যাচ্ছে ভারত রয়েছে বিশ্বের প্রথম স্থানে। রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রকাশ করা তালিকা অনুযায়ী বর্তমানে ভারতের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৮৬ লক্ষ আর চীনের জনসংখ্যা ১৪২ কোটি ৫৭ লক্ষ। অর্থাৎ চীনের চেয়ে ২৯ লক্ষের বেশি মানুষ ভারতে বাস করেন। রাষ্ট্রসঙ্ঘের এফপিএ-এর দ্য স্টেট অব ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রিপোর্ট, ২০২৩ সালেই রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুমান ছিল, চীনকে ছাপিয়ে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল দেশ হতে চলেছে ভারত। ২০২৩ সালেই সেই অনুমান সত্যি হয়ে গেল।

রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতের মোট জনসংখ্যার ২৫ শতাংশ মানুষের বয়স ১৪ বছরের মধ্যে। ১৮ শতাংশের বয়স ১০ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। ১০ থেকে ২৪ বছর বয়সের জনসংখ্যা ২৬ শতাংশ। ১৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সের মধ্যে জনসংখ্যা ৬৮ শতাংশ। ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে বয়স, তার শতকরা হার ৭ শতাংশ।

প্রশ্ন উঠবে, জনসংখ্যার দিক থেকে কোনও দেশকে ছাপিয়ে যাওয়া কি বড়ো উপলব্ধি হতে পারে? কোনো দেশের জনসংখ্যা যেমন সেই দেশের সম্পদ তেমনি অতিরিক্ত জনসংখ্যাও দেশের উন্নতিতে বাধা সৃষ্টি করে। অতিরিক্ত জনসংখ্যা দেশের উন্নয়নে বড়ো হুমকি। বিশেষজ্ঞদের মতে এটা ভারতের জন্য অশনিসংকেত। শীঘ্রই জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা না নেওয়া হলে আগামী কয়েক বছরে ভারতে জনবিস্ফোরণ ঘটবে। আর তার ফল যে খুব ভালো হবে না তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

কোনো দেশে জনবিস্ফোরণ ঘটলে তার ফলে সব থেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয় সেই দেশের অর্থব্যবস্থা। একদিকে যেমন মাথাপিছু আয় কমতে থাকবে অপরদিকে দেখা যাবে বেকারত্ব। জাতীয় পরিসংখ্যান অফিসের (এনএসও) তথ্যানুসারে, ভারতে মোট জাতীয় আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মাথাপিছু আয়, ২০২২-২৩ সালে ছিল ১,৭২,০০০ টাকা। এটি তার আগের বছরের তুলনায় ১৫.৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৪-১৫ সালের শুরুর সময়ে আবার মাথাপিছু আয় ছিল মাত্র ৮৬,৬৪৭ টাকা করে। যদিও বিগত কয়েক বছরে ভারতে মানুষের মাথাপিছু আয় অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে কিন্তু তাও বিশ্বের উন্নত দেশগুলি নিরিখে এটা তেমন কিছুই না। উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশে পরিণত হতে ভারতের মাথাপিছু আয় আরও বাড়া দরকার। তাই এখন যদি জনসংখ্যা না নিয়ন্ত্রণে আনা যায় এবং এই হারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে তাহলে মাথাপিছু আয় আরও কমতে থাকবে।

অত্যধিক জনসংখ্যার ফলে দেশের এক বিরাট অংশের মানুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে না। যার ফলে সৃষ্টি হবে বেকারত্ব। আর বেকারত্ব কোনো দেশের সরকারের কাছে এক বড়ো সমস্যা। এর ফলে দেশের মানুষের জীবনযাত্রার মান কমে যায়। আবার বৃহৎ পরিবারের স্বল্প আয় শিক্ষার প্রসারেও বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলস্বরূপ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বিশেষত গ্রামের দিকে মেয়েদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার আগেই বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। অর্থাৎ বাল্যবিবাহের জন্য পরোক্ষভাবে অত্যধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধিই দায়ী।

প্রায়শই বাংলাদেশ থেকে ভারতে অনুপ্রবেশের খবর পাওয়া যায়। পশ্চিমবঙ্গের ভারত-বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বর্ডারের এক বিরাট অংশে কোনো কাঁটাতারের বেড়া নেই। এর ফলে সেখান দিয়ে অবাধে অনুপ্রবেশ ঘটে। বাংলাদেশের দীর্ঘদিন অত্যাচারিত হয়ে বহু হিন্দু যেমন শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে তেমনি আবার কারণ ছাড়া বহু বাংলাদেশি মুসলমান ভারতে অনুপ্রবেশ করছে। এর ফলে সীমান্তবর্তী জেলায় দ্রুত জনসংখ্যার পরিবর্তন হচ্ছে। অনুপ্রবেশের ফলে এই সীমাহীন জনসংখ্যা বৃদ্ধি ভারতের জন্য চিন্তার। এই বিষয়ে চাই কড়া পদক্ষেপ। আর দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা এই অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করতে একমাত্র উপায় হলো এনআরসি ও সিএএ। □

এবারের আইপিএলে রাহানে নিজেকে নতুন করে চেনাচ্ছেন

নিলয় সামন্ত

ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগের ১৬ তম আসরে গত ২৩ এপ্রিল পর্যন্ত আইপিএল-এ খেলা হয়েছে ৩৩টি ম্যাচ। আর ৩৩টি ম্যাচের পরে ইডেন গার্ডেন্সের মাঠে চেন্নাই দল এবারের আইপিএল-এ প্রথমবারের মতো পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে পৌঁছাতে সফল হয়েছে। এখনও পর্যন্ত রাজস্থান রয়্যালস, লখনউ সুপার জায়ান্টস এবং গুজরাট টাইটানস লিগ টেবিলের শীর্ষস্থানে ছিল। গত ২৩ তারিখ রাতে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে হারিয়ে পয়েন্ট টেবিলে সকলকে পিছনে ফেলে দিয়েছে চেন্নাই। যেখানে এমএস ধোনির নেতৃত্বাধীন দল ১০ পয়েন্ট নিয়ে টেবিলের শীর্ষে করছে। চেন্নাই শীর্ষে উঠতেই নিজেদের অবস্থান হারিয়েছে লখনউ ও রাজস্থান। তারা একধাপ করে নীচে নেমে গিয়েছে।

আইপিএল ২০২৩ পয়েন্ট টেবিলে চেন্নাই-ই একমাত্র দল যাদের অ্যাকাউন্টে এখনও পর্যন্ত ১০ পয়েন্ট রয়েছে। যদিও চেন্নাই সুপার কিংসের পরে দুই নম্বরে রয়েছে রাজস্থান রয়্যালস এবং তাদের অ্যাকাউন্টে ৮ পয়েন্ট রয়েছে। তবে আইপিএলের এই মরশুমের টেবিলে রাজস্থান-সহ মোট পাঁচটি দলের অ্যাকাউন্টে রয়েছে আট পয়েন্ট। রাজস্থান ছাড়া কি দলগুলো হলো লখনউ, গুজরাট, ব্যাঙ্গালুরু ও পঞ্জাব। এই তালিকায় এক নম্বরে রয়েছে গুজরাট টাইটানস। তালিকার পাঁচ নম্বরে রয়েছে বিরাট কোহলির রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরু এবং ছয় নম্বরে রয়েছে পঞ্জাব কিংস।

একই সময়ে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্স দল ৬ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে তালিকার সাত নম্বর রয়েছে। অন্যদিকে চেন্নাইয়ের কাছে হেরে সাত ম্যাচে চার পয়েন্ট নিয়ে তালিকার আট নম্বরে রয়েছে কলকাতা নাইট রাইডার্স। চার পয়েন্ট নিয়ে তালিকার নয় নম্বরে রয়েছে সানরাইজার্স হায়দরাবাদ। এই তালিকার একেবারে শেষে

রয়েছে দিল্লি ক্যাপিটলস। তাদের সংগ্রহ মাত্র ২ পয়েন্ট। ৬টি ম্যাচ খেলে মাত্র একটি খেলায় জিততে পেরেছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়দের দিল্লি ক্যাপিটলস।

এখনও পর্যন্ত প্রত্যেকটি দল প্রায় সাত থেকে ছয়টি ম্যাচ খেলে ফেলেছে। এমন অবস্থায় পয়েন্ট টেবিলে আবারও চারের মধ্যে নিজেদের জায়গা পাকা করতে হলে প্রায় সবকটি ম্যাচ জিততে হবে কলকাতা নাইট রাইডার্সকে। এরপর থেকেই হয়তো শুরু হবে লিগ টেবিলের আসল লড়াই। এখন দেখার কোন দল উপরের দিকে উঠে আসে আর কোন দল নীচের দিকে নেমে যায়। চেন্নাই শীর্ষে থাকলেও রাজস্থান রয়্যালস বর্তমানে দ্বিতীয়, লখনউ সুপার জায়ান্টস তৃতীয়, গুজরাট টাইটান্স চতুর্থ, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর পঞ্চম এবং পঞ্জাব কিংস ছয় নম্বরে রয়েছে। এই দলগুলোর মধ্যে গুজরাট বাদে বাকি দলগুলো ৭টি করে ম্যাচ খেলে চারটি করে ম্যাচ জিতেছে। এরপরই আসে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের সংখ্যা, যারা ৬টি ম্যাচের মধ্যে ৩টিতেই জয়ী হয়েছে। একই সময়ে, কলকাতা নাইট রাইডার্স ৭ ম্যাচের মধ্যে মাত্র ২টি জিতেছে। সানরাইজার্স হায়দরাবাদ ৬ ম্যাচের মধ্যে জিতেছে ২টিতে। ৬ ম্যাচের মধ্যে একটি জিতেছে দিল্লি ক্যাপিটলস।

রবিবার ইডেনে কেকেআরের বিরুদ্ধে ইডেন গার্ডেন্সে ২৯ বলে অপরাজিত ৭১ রানের বিধ্বংসী ইনিংস খেলেন রাহানে। ছ'টি চার এবং পাঁচটি ছক্কায় সাজানো ছিল তাঁর ইনিংস। 'টেস্ট' খেলোয়াড় হিসেবে পরিচিত রাহানের স্ট্রাইক রেট ছিল ২৪৪.৮২। সেই ইনিংসের সুবাদে যথারীতি ম্যাচের সেরাও নির্বাচিত হন। যে দিনটার জন্য তাঁকে সাত বছর অপেক্ষা করতে হয়েছে। সাত বছরে আইপিএলে প্রথমবার ম্যাচের সেরার পুরস্কার পেলেন। তাই স্বভাবতই বাড়তি একটা উন্মাদনা কাজ করতে থাকে রাহানের মধ্যে। সঙ্গে চোখে-মুখে ফুটে ওঠে আত্মবিশ্বাস। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ২৭ বলে ৬১ রান, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ১৯ বলে ৩১ রান, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ২০ বলে ৩৭ রান, কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে ২৯ বলে অপরাজিত ৭১ রান, এবার আইপিএলে যেন এক স্তরে পৌঁছে গিয়েছেন অজিঙ্কা রাহানে। শুধু যে রান করছেন, তাই নয়। স্ট্রাইক রেট অবিশ্বাস্য থাকছে। তবে তাঁর বিশ্বাস, এখনও নিজের সেরাটা আসেনি। সেটা আসতে এখনও বাকি আছে।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাহানে বলেন, 'এবারের আইপিএলে এখনও পর্যন্ত যে ইনিংসগুলি খেলেছি, সেগুলির প্রতিটি উপভোগ করেছি। আমার বিশ্বাস যে আমার সেরাটা এখনও আসেনি। প্রতিটি ইনিংস উপভোগ করেছি আমি। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ৩৭ রান, রাজস্থান রয়্যালসের বিরুদ্ধে ৩০ রানের মতো ইনিংস হোক বা মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে ৬১ রানের ইনিংসে হোক--- আমি প্রতিটি ইনিংস উপভোগ করেছি।' সবমিলিয়ে এবার আইপিএলে এখনও পর্যন্ত মোট পাঁচটি ম্যাচে খেলেছেন রাহানে। করেছেন ১৯৯ রান। স্ট্রাইক রেট ১৯৯.০৪। একমাত্র সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে রান পাননি। □

বাচ্চাদের জুতো ছোটো হয়ে যাওয়ার দিন শেষ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বাচ্চা বড়ো হলে তার পা-দুটিও বড়ো হবে। স্বাভাবিক নিয়মে ছোটো হবে আপনার বাচ্চার পুরনো জুতোটি। অগত্যা, নতুন কেনা ছাড়া আর উপায় নেই। মেটামুটি এটাই রীতি। কিন্তু পুনের সত্যজিৎ মিত্তাল এই রীতিকে উলটে দিয়েছেন। সত্যজিৎ বাচ্চাদের জন্য এমন এক বিশেষ জুতো তৈরি করেছেন যা বাচ্চারা বড়ো হবার সঙ্গে সঙ্গে নিজেও বড়ো হবে এবং বাচ্চার পরিবর্তিত পায়ের মাপের সঙ্গে মানানসই হয়ে উঠবে।

ব্যাপারটা আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য। জুতো বড়ো হয়— এরকম আজগুবি কথা কে কবে শুনেছে! কিন্তু অটেরো নামক স্টার্ট আপের তিরিশ বছর বয়সি কর্ণধার সত্যজিৎ মিত্তাল এমন একটি প্রায় অবাস্তব ঘটনাকে সম্ভব করে তুলেছেন। এরকম একটা আইডিয়া মাথায় কীভাবে এলো? উত্তরে সত্যজিৎ বলছেন, 'জীবনের প্রথম দশ বছরে বাচ্চারা সঠিক জুতো পরে না। ০-৩ বছরের মধ্যে বাচ্চাদের পায়ের মাপ তিন মাস অন্তর পরিবর্তিত হয়। ০-৯ বছরের মধ্যে মোটামুটি ১৫ রকমের মাপের জুতোর প্রয়োজন হয়। ১৩ বছর বয়স হলে বাচ্চাদের পায়ের মাপ আর বদলায় না। এই যে বাচ্চার পা বাড়ছে কিন্তু জুতো এক জায়গায় ফিক্সড— সমস্যাটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলাম। ভারতে ভাবতেই আইডিয়াটা পেয়ে যাই। ইন্ডিয়ান ফুটওয়ার ইন্ডাস্ট্রির যারা মাথা তাদের কথায় ও কাজের ফারাকটাও চোখে পড়েছিল সত্যজিতের। লক্ষ্য করেছিলেন ক্রেতার চাহিদা আর বাজারজাত পণ্যের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান। সত্যজিৎ বলেন, 'বড়ো বড়ো ব্র্যান্ডগুলো সবসময় বড়োদের জুতো তৈরিতে বেশি নজর দেয়। ওদের কাছে বাচ্চাদের জুতো মানে হলো বড়োদের জুতোটা বাচ্চাদের পায়ের মাপে তৈরি করে চালিয়ে দেওয়া। ওরা বাচ্চাদের পায়ের হাড়ের গঠন সম্বন্ধে কিছুই জানে না। বাচ্চাদের পায়ের পাতার হাড়ের গঠন বড়োদের থেকে আলাদা হয়।'

২০২০ সালে সত্যজিৎ বাচ্চাদের পায়ের হাড়ের গঠন নিয়ে গবেষণা শুরু করেন। এ ব্যাপারে ওকে সাহায্য করেন বিখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরা। গবেষণা করতে করতেই সত্যজিৎ জানতে পারলেন বাচ্চাদের পায়ের পাতা একটু চওড়া হয়। হাড়ের গঠনও প্রথম তিন বছরে মজবুত হয় না। কিন্তু হাজার-হাজার নার্ভের শেষ প্রান্ত রয়েছে পায়ের পাতায়। সুতরাং পায়ের পাতাকে কিছুতেই অবহেলা করা যাবে না। দু' বছর গবেষণা করার পর সত্যজিৎ মিত্তাল বাচ্চাদের জন্য এমন এক জুতো তৈরি করতে সক্ষম হলেন যা বাচ্চার সঙ্গে নিজেও বাড়বে।

২০২২ সালে তৈরি হলো স্টার্ট আপ অটেরো। এবার সঙ্গী ছোটোবেলার বন্ধু কৃতিকা লাল। অটেরোর সেলস ও মার্কেটিং এখন কৃতিকাই দেখেন। সত্যজিৎ জানিয়েছেন, 'আমরা বাচ্চাদের সব সাইকেলের জন্য সঠিক মাপের জুতো তৈরি করতে চেয়েছিলাম। আমরা যে জুতো বানিয়েছি তা বাচ্চার পায়ের ১৮ মিলিমিটার পর্যন্ত গ্রোথ ম্যানেজ করতে পারে। অটোরোর তৈরি জুতোর দাম ১৮০০ থেকে ২৬০০ টাকার মধ্যে। মূলত দিল্লি, পুনে, মুম্বই ও বেঙ্গালুরুর বাচ্চারাই অটেরোর ক্রেতা।

অটেরোর তৈরি জুতো সম্বন্ধে সবচেয়ে দামি কথা বলেছেন মিরাটের শ্রেয়া জৈন। শ্রেয়ার চার বছরের ছেলে আগে পায়ে জুতো রাখতেই চাইত না। আর এখন অটেরোর জুতো পরার পর থেকে জুতো খুলতেই চায় না। দেশের বাচ্চাদের পায়ে পায়ে এক অমোঘ জাদু বুনে দিয়েছেন সত্যজিৎ। □

নালন্দা ধ্বংসের কথা

ছোট্টো বন্ধুরা, তোমরা নালন্দার নাম শুনেছ। পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অন্যতম। সারা পৃথিবী থেকে মেধাবী ছাত্ররা এখানে পড়তে আসতেন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটিই শুধু ন'তলা ছিল। আর তাতে ৯০ লক্ষ

পাণ্ডুলিপি আর বিভিন্ন বিষয়ের লক্ষ লক্ষ পুস্তক ছিল। দশ হাজার ছাত্র এখানে পড়াশোনা করতেন। দু'হাজার অধ্যাপক তাদের পড়াতেন। আর তা সম্পূর্ণ নিঃশুল্কে। এই শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়টি বৈদেশিক আক্রমণকারী বখতিয়ার খিলজি আগুনে পুড়িয়ে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে ফেলেছিল।

প্রশ্ন উঠবে, কেন বখতিয়ার খিলজি নালন্দা ধ্বংস করল? এটা তো কোনো দুর্গ ছিল না, কোনো রাজ প্রাসাদ ছিল না অথবা ধনসম্পদে পরিপূর্ণ কোনো মন্দির ছিল না? বখতিয়ার খিলজি উত্তর ভারতের কিছু এলাকা দখল করে পুরো ভারত দখলের ছক কষছিল। এমন সময় সে মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়ে। দিন দিন তার শরীর খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তার সঙ্গের হাকিমরা কিছুই করতে পারছিল না। সেই সময় কেউ একজন তাকে বলে,মগধরাজ্যে নালন্দা বলে একটি বিশ্ববিদ্যালয় আছে, সেখানকার আয়ুর্বেদ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান রাহুল শ্রীভদ্র একজন শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। তিনি যদি চিকিৎসা করেন তাহলে খিলজি সুস্থ হয়ে উঠবে। কিন্তু খিলজি মুসলমান হওয়ায় কোনো হিন্দুর কাছ থেকে চিকিৎসা করাতে রাজি হলো না। এদিকে তার অবস্থা মারাত্মক আকার ধারণ করল। তখন বাধ্য হয়ে রাহুল শ্রীভদ্রকে তার শিবিরে আনার জন্য লোক পাঠাল।

যথাসময়ে রাহুল শ্রীভদ্র বখতিয়ার খিলজির শিবিরে পৌঁছলেন। খিলজি তাকে বলল একটি শর্তে চিকিৎসা নিতে পারি। আপনি আমাকে স্পর্শ করতে পারবেন না আর আপনার দেওয়া কোনো ওষুধ আমি গ্রহণ করব না। রাহুল শ্রীভদ্র তাতেই রাজি হয়ে গেলেন।

দু'দিন পরে রাহুল শ্রীভদ্র একটি কোরান হাতে খিলজির শিবিরে এলেন। খিলজিকে বললেন, এই কোরানটি এক মাসের মধ্যে আপনাকে পড়ে ফেলতে হবে আর তাতেই আপনি সুস্থ হয়ে উঠবেন। একজন বিধর্মীর কথায় খিলজি বিশ্বাস করল না কিন্তু পুস্তকটি যেহেতু কোরান, তাই পরদিন থেকে পড়তে শুরু করে দিল। কিন্তু কী আশ্চর্য, তিনদিন পর থেকেই খিলজি সুস্থ বোধ করতে লাগল। এবং একমাসের মধ্যেই সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেল।

সুস্থ তো হলো, কিন্তু তার মনে রাগ হতে শুরু করল। তার মুসলমান হাকিমরা যা পারল না তা একজন বিধর্মী হিন্দু করে দেখাল! খিলজি শ্রীভদ্রকে আবার ডেকে তার সুস্থ হবার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারল যে কোরানের পাতায় পাতায় ওষুধচূর্ণ মেশানো ছিল। খিলজি কোরানটি পড়ার সময় আঙুলে থুথু লাগিয়ে পৃষ্ঠা ওলটানোর ফলে সেই ওষুধ তার শরীরে গিয়ে তাকে সুস্থ করেছে।

সবকিছু শোনার পর খিলজি রাগে কাঁপতে লাগল। তার সেনাপতি বলল, জাঁহাপনা, এই রাহুল শ্রীভদ্র একা নয়, ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'হাজার অধ্যাপক এবং দশহাজার ছাত্র সকলেই এরকম এক-একটি বিদ্যায় পারদর্শী। খিলজি তৎক্ষণাৎ শ্রীভদ্রকে তরবারির আঘাতে দু'টুকরো করে ফেলল আর সেনাপতিকে বলল এরকম বিশ্ববিদ্যালয় থাকলে তো ভারতে ইসলামের রাজত্ব কায়েম করা যাবে না। ওটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দাও। আর হ্যাঁ, অধ্যাপক ও ছাত্রগুলোকেও ওই আগুনের মধ্যে ফেলে মেরে ফেল। খিলজির নির্দেশে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় নালন্দাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দেওয়া হলো। ঐতিহাসিক মিনহাজ সিরাজ তার 'তবকাত-ই-নাসিরী'তে লিখেছেন, নালন্দার গ্রন্থাগারের বইপুঁথি পুড়ে ছাই হতে তিনমাস সময় লেগেছিল।

ছোট্টো বন্ধুরা, খিলজি শুধু নালন্দাকে ধ্বংস করেই ক্ষান্ত হয়নি, বহু মঠ-মন্দির, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞানভাণ্ডার শেষ করে দিয়েছিল।

দেবব্রত ভৌমিক

বীর বনবাসী

তলক্কল চান্দু

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে কেরলের ওয়াইনাড়ের কুরিচ্যা জনজাতি বীরেদের কথা ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। ইংরাজ সরকার জনজাতি কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ওপর উচ্চ হারে কর বসানোর প্রতিবাদে তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে লড়াইয়ে শামিল হয়। প্রতিবেশী রাজা আগেই ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সূচনা করেছিলেন। বীর তলক্কল চান্দুর নেতৃত্বে হাজার হাজার যোদ্ধা রাজার সৈন্যদের সঙ্গে মিলিতভাবে পনমরম দুর্গ আক্রমণ করে। ইংরেজ সৈন্যকে পরাস্ত করে তারা দুর্গ দখল করে নেয়। এই ঘটনার পর ইংরেজরা তলক্কল চান্দুকে নিশানা করে। অনেক চেষ্টা করেও তারা তাকে ধরতে পারেনি। কিন্তু এক সহযোগীর বিশ্বাসঘাতকতায় চান্দু গ্রেপ্তার হন। ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দের ১৫ নভেম্বর ইংরাজ তাঁরে প্রকাশ্যে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করে।

জানো কি?

- ভারতের দীর্ঘতম নদীসেতু 'ধোলা সাদিয়া ব্রিজ, ভূপেন হাজারিকা সেতু' (৯১৫০ মিটার)। ব্রহ্মপুত্র নদের উপর।
- ভারতের দীর্ঘতম উপনদী যমুনা।
- মেঘালয়ের উমগট নদীকে ভারতের আয়না বলা হয়।
- সর্বোচ্চ নদ হওয়ায় ব্রহ্মপুত্রকে স্কাই রিভার বলা হয়।।
- বিতস্তা নদী ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে আন্তর্জাতিক সীমানা তৈরি করেছে।
- ব্রহ্মপুত্র নদ তিব্বতে সাংপো নামে পরিচিত।

ভালো কথা

কাকের চিকিৎসা

সেদিন বিকেলে আকাশ অন্ধকার করে ঝেঁপে বৃষ্টি শুরু হলো। কিছুক্ষণ পরেই শিল পড়তে শুরু করল। আমাদের উঠোন সাদা হয়ে গিয়েছিল। দু'একটা ছিটকে বারন্দায় আসছিল। আমি আর ভাই একটা গেলাসে জমা করছিলাম। মা, বাবা বারন্দায় দাঁড়িয়ে শিলাবৃষ্টি দেখছিল। হঠাৎ একটা কাক উঠোনে পড়ে গেল। বাবা সঙ্গে সঙ্গে একটা পিঁড়ি মাথায় দিয়ে কাকটিকে বারন্দায় নিয়ে এল। বাবা হোমিওপ্যাথি বাক্স খুলে এক ফোঁটা ওষুধ কাকাটির মুখে দিল। একটু পরেই কাকটি ভালো হয়ে গেল। রাতে বাবা ওটাকে একটা ঝুড়ি ঢাকা দিয়ে রেখে দিল। বাবা পরদিন সকালে কাকাটিকে পাউরুটির দুটো টুকরো দিতেই খেয়ে নিল। তারপর দুবার কা কা করে উড়ে চলে গেল।

শ্যামল সরকার, অষ্টম শ্রেণী, ফারাক্কা ব্যারেজ কলোনি, মুর্শিদাবাদ।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

আমার ভাই

সুপর্ণা ঘোষ, অষ্টম শ্রেণী, হলদিয়া, দুর্গাচক , পূর্ব মেদিনীপুর।

আমার ভাই
বেজায় গরম পড়লে পরেও
কান্নাকাটি নাই।
বৃষ্টি হলে বেজায় খুশি
কাদায় করে হুটোপুটি
পড়তে বসার নামটি তার নাই।
সারাদিন শুধু খেলা
খেলনাও তার আছে মেলা
কিন্তু আরো অনেক চাই,
আমি দেখে হিংসে করি
শুধুই ভাবি কী যে করি
মনে পড়ে সে তো আমার ভাই।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

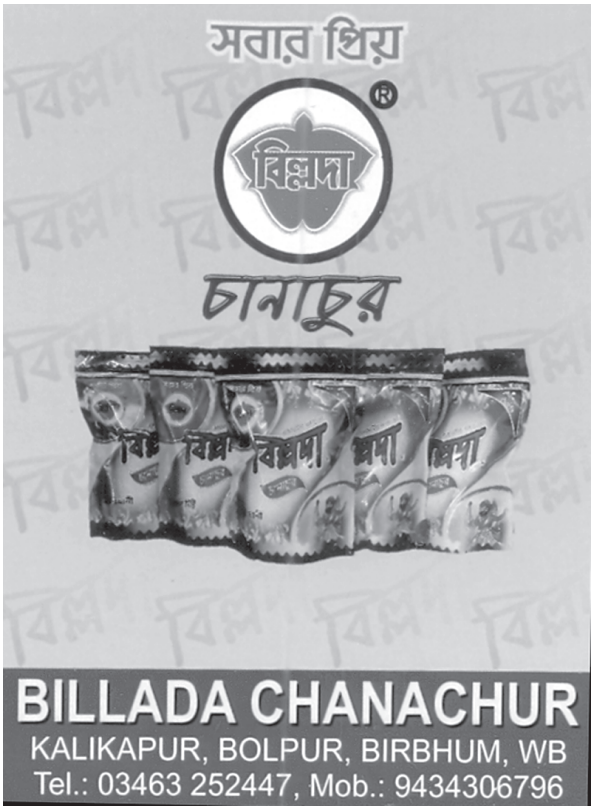

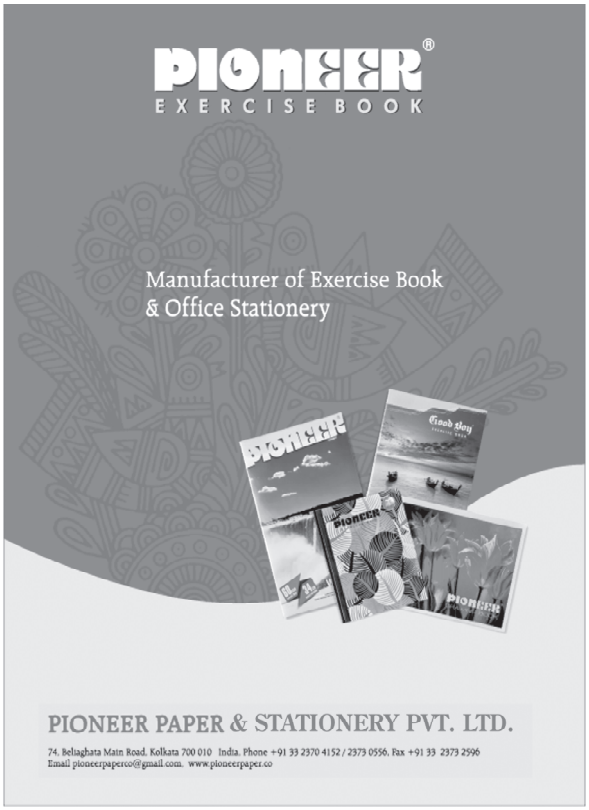

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

পাকিস্তান আপাতত গাধা রপ্তানি করে বাঁচতে চায়

মণীন্দ্রনাথ সাহা

১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট পাকিস্তান এবং ১৫ আগস্ট ভারত ইংরেজ শাসকদের কবল থেকে মুক্ত হয়ে বিশ্বের দরবারে দুটি স্বাধীন পৃথক দেশ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তারপর থেকে ভারত সরকার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছে— কীভাবে দেশের জনগণের পাঁচটি মৌলিক চাহিদা—যথা, খাদ্য, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা এবং পরিধান সমস্যা মেটানো সম্ভব এবং এই সমস্ত বিষয়ে প্রায় পূর্ণ সফল হয়েছে।

যে ভারত স্বাধীনতার পর আমেরিকার পোকা খাওয়া গমের ওপর নির্ভরশীল ছিল, সেই ভারত এখন নিজের দেশের খাদ্যের চাহিদা মিটিয়ে উদ্বৃত্ত চাল, গম বিশ্বের বহু দেশে রপ্তানি করছে। এমনকী রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের আবহে ভারতের গমের জন্য আরব-সহ পশ্চিমের দেশগুলোর মধ্যে কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে।

চিকিৎসা ক্ষেত্রেও ভারত নজরকাড়া সাফল্য অর্জন করেছে। তার প্রমাণ আমরা পেয়েছি কোভিড মহামারিতে ভ্যাকসিন আবিষ্কার এবং বহু গরিব দেশকে তা বিনামূল্যে সরবরাহ করার মধ্যে। ঠিক তেমনি ভাবে শিক্ষা, বাসস্থান এবং পরিধান ক্ষেত্রেও পূর্ণ সাফল্যের দিকে পৌঁছে যাচ্ছে ভারত। আর শিল্প ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যে সাফল্য অর্জন করেছে তা এক কথায় বিশ্ববাসীকে চমকে দিয়েছে। ভারত আজ বিশ্বের বহু দেশে নিজের উৎপাদিত সমরাস্ত্র রপ্তানি শুরু করেছে। আর্থিক দিক দিয়ে ভারত এখন ইউকে-কে টপকে পঞ্চম স্থান দখল করেছে। ভারতের আগে আর্থিক দিক দিয়ে যে দেশগুলো এগিয়ে রয়েছে সেগুলো হলো— (১) আমেরিকা, (২) চীন, (৩) জাপান এবং (৪) জার্মান।

পঁচাত্তর বছরে ভারতের নজরকাড়া সাফল্যে বিশ্ব যখন হতবাক তখন পাকিস্তানের সাফল্য কি? তারা কি কোনো কিছুতেই উন্নতি করেনি? নিশ্চয়ই করেছে। এবার তাদের উন্নতির সাফল্যগুলো দেখে নেওয়া যাক। পাকিস্তান তার জন্মলগ্ন থেকেই শুরু করেছে ভারত বিরোধিতা। প্রথমে কাশ্মীর আক্রমণ এবং তৎকালীন ভারতের

প্রধানমন্ত্রীর বদান্যতা কাশ্মীরের কিছু অংশ জবরদখল করে রাখা। তাতে তারা উৎসাহিত হয়ে স্লোগান তুলেছিল--- 'হাসকে লিয়ে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে হিন্দুস্থান।' কিন্তু তাতে তারা সফল হয়নি।

আমেরিকা-চীনের উস্কানি এবং নিজেদের মুর্খামির কারণে তিনবার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মুখপোড়া হনুমান হয়েছে। তাতে তারা লজ্জিত না হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপদজ্জনক সব সন্ত্রাসবাদীদের ডেকে এনে নিজের দেশে জামাই আদরে রেখে ভারতে অস্থিরতা তৈরির জন্য তাদের ব্যবহার করেছে এবং এখনও করে চলেছে। জন্মলগ্ন থেকেই পাকিস্তান ভিক্ষাবৃত্তি করতে করতে এমন মানসিকতায় তারা পৌঁছেছে যে ভিক্ষা ছাড়া নিজের কর্মক্ষমতা দিয়ে রোজগারের চেষ্টা তারা করেনি। এই তো কিছুদিন আগে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডারের কাছে ভিক্ষাপাত্র নিয়ে গিয়েছিল, কিন্তু তারা জানিয়ে দিয়েছে— 'পাকিস্তানের গায়ে ধূসর তালিকা নামক যে দুর্গন্ধযুক্ত কাদা লেগে আছে, আগে তা পরিষ্কার হোক, তারপরে ভিক্ষা দেওয়ার চিন্তা-ভাবনা করা যাবে।'

ভারতের বিরুদ্ধে জুলফিকার আলি ভুট্টোর হাজার বছরের যুদ্ধের হুমকি, পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীদের অপদার্থতা, শরিফ, ইমরান খানদের সন্ত্রাসবাদীদের নিয়ে উন্মাদনা সব এখন থেমে যাচ্ছে। নতুন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ খান এখন ধীর গলায় বলতে বাধ্য হচ্ছেন, ভারতের সঙ্গে তারা ব্যবসা চালু করতে চায়। কিন্তু সে কথা তিনি জোর দিয়ে বলতে পারছেন না। কারণ— পেছন থেকে কাঠ মোল্লারা যদি সেকথা শুনতে পায় তাহলে শাহবাজ খানের গদিটা নাও থাকতে পারে।

ভারত যখন বুলেট ট্রেন চালাচ্ছে, সুপারসনিক মিসাইল উৎক্ষেপণ করছে, উন্নতমানের রণতরি নির্মাণ-সহ চাঁদে চন্দ্রযান পাঠাচ্ছে, ঠিক সেই সময় পাকিস্তান কাপুরুষের মতো পেছন থেকে চোরের মতো রাতের অন্ধকারে ভারতে সন্ত্রাসবাদী পাঠিয়ে দু'চারজন সাধারণ নাগরিক বা সেনা জওয়ান হত্যা করাচ্ছে। আর তাতে কাঠমোল্লারা বেজায় খুশি হয়ে সরকারের পিঠ চাপড়ে, দিচ্ছে।

অন্যদিকে বন্ধু চীন পাকিস্তানকে ঋণের জালে জড়িয়ে রেখেছে। বাধ্য হয়ে পাকিস্তান সৌদি আরবের কাছে গিয়ে ভিক্ষা চাইলে সৌদি সোজা পথ দেখিয়েছে বাড়ি ফিরে যাওয়ার। তাহলে পাকিস্তান এখন কী করবে? তারা কি না খেয়ে মরবে? না খাবার জোগাড় করতে পারবে? হ্যাঁ, তারা না খেয়ে মরবে না। সম্প্রতি জানা গিয়েছে যে পাকিস্তান বাঁচার জন্য এখন গাধা এবং কুকুরের ব্যবসা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আরও জানা গিয়েছে পাকিস্তান বিশ্বে গাধা উৎপাদনে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। আর বিশ্বের বহু দেশ গাধা আমদানি করে থাকে। কাজেই অন্যান্য দেশের সঙ্গে চীনেও গাধার সঙ্গে কুকুর যদি রপ্তানি করা যায় তাহলে বিপুল পরিমাণ গাধা এবং কুকুরের গতি হতে পারে এবং সে দেশের আর্থিক সমস্যা মিটতেই পারে। উপরন্তু চীন সর্বভূক দেশ। তারাও হয়তো আপত্তি করবে না। কিন্তু পাকিস্তানের এই সিদ্ধান্তে না কি সে দেশের পশুসমাজ এখন বিশেষভাবে আতঙ্কিত। □

ফঃ ৬

কালে কালে আরো কত কি দেখিবো!

শিতাংশু গুহ

ঢাকার শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নামটি বর্তমান আওয়ামি লিগ সরকারের দেওয়া। কারণ জিয়ার নাম বাদ দিয়ে এমন একটি নাম দিতে হবে যাতে সহজে নামটি বদল করা না যায়? এজন্যে নামের সঙ্গে একটু ধর্মীয় অনুভূতি যোগ করে দেওয়া হয়েছে। জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নামটি রেখেছিল বিএনপি। অথচ এর পূর্বেকার নাম ছিল 'কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর'। নাম পরিবর্তনের এই লেখাটি রাজনৈতিক, তবে ধর্মীয় সুড়সুড়ি বা অনুভূতি জড়িত হয়েছে।

বাংলাদেশে এখন ধর্মের চাইতে 'অনুভূতি' বড়ো হয়ে দেখা দিচ্ছে। ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অজুহাতে রামু থেকে কুমিল্লায় অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে। সদ্য বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী একজন মহিলা নির্বাহী কর্মকর্তাকে এক মুক্তিযোদ্ধার জানাজায় আসতে বাধা দিয়েছেন। এর পেছনে ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকা সম্ভব, যদিও তিনি 'অনুভূতি'-কে কাজে লাগিয়েছেন। অথচ বঙ্গবীরকে যদি নারী প্রধানমন্ত্রী ডাকেন তিনি সুড়সুড় করে এসে 'কদমবুচি' করবেন।

এ লেখাটি নাম পরিবর্তন নিয়ে, 'নামেই কিবা আসে যায়, যখন যে নামে খুশি ডেকো গো আমায়'! খুলনা শহরের বিখ্যাত 'শিববাড়ি মোড়' হঠাৎ করে 'বঙ্গবন্ধু মোড়' হয়ে যাচ্ছিলো, সামাজিক মাধ্যমে হৈচৈ শুরু হলে পৌর কর্পোরেশন সিদ্ধান্ত পালটায়। নিউইয়র্কে 'ইউনাইটেড হিন্দুজ অব ইউএসএ জ্যাকসন হাইটসে এক সমাবেশে এর প্রতিবাদ করে। ইত্তেফাকে বেরিয়েছে, খুলনা সিটি'র মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক বলেছেন 'ঐতিহ্যবাহী শিববাড়ি মোড়-সহ দুটি মোড়ের নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করা হয়েছে।

বিমান বন্দরের নাম পরিবর্তনে ধর্ম ব্যবহার এবং শিববাড়ি মোড়ের নাম বদলে বঙ্গবন্ধুকে টেনে আনা এক ধরনের বিপত্তি। ধর্ম ও বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে টানাটানি না করলেই কি নয়? শিববাড়ি মোড় হয়তো বদল হবে না, কিন্তু বিমান বন্দরের নাম সরকার পরিবর্তন হলে আবারো পরিবর্তন হবে না, এ গ্যারান্টি কোথায়? হজরত শাহজালাল ধর্মীয় নেতা, তিনি বাঙ্গালি নন, তাঁর নাম আমদানি করা কতটা যৌক্তিক? বিমান বন্দরের নাম বদলের কর্মটি কিন্তু প্রথম শুরু করে বিএনপি?

জয়দেবপুর আশির দশকে বেশ ঘটা করে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'গাজীপুর' হয়। এদের কাউকে কাউকে আমি চিনতাম, তাঁরা একটি ম্যাগাজিন বের করেছিল, কপি আমার কাছে আছে। এ পরিবর্তনের পক্ষে যত কারণই দেখানো হোক না কেন, ভেতরের কারণটি অন্য। নিউইয়র্কের মৌলানা কাউয়ুম 'জোক' করে লিখেছেন, 'খুলনা' একটি অশ্লীল শব্দ, মুসলমান দেশে এমন নাম থাকতে পারে না, এটি পালটিয়ে 'ঢাকনা' রাখা উচিত। নিশিত বিশ্বাস উত্তরে লিখেছেন, 'খুলনা তো খোলা, তাই এটি বোরখায় ঢেকে দেওয়া হোক'।

খালেদা জিয়া একবার গোপালগঞ্জের নাম বদলাতে চেয়েছিলেন। এটি রাজনৈতিক। বিক্রমপুর থেকে মুন্সীগঞ্জ হবার কারণ অন্য। তেমনি কালীগঞ্জ হয়েছে নেত্রকোনা, চট্টগ্রামের ব্রাহ্মণপাড়া হয়েছে বুরহানবাগ, শ্রীহট্ট হয়েছে সিলেট, সুনামগঞ্জের দুর্গাপাশা হয়েছে দরগাপাশা, স্বরূপকাঠির হিন্দুরহাট হয়েছে মিয়ারহাট, সুনামগঞ্জের দুর্গাপুর হয়েছে দরগাপুর, ঢাকার রামচন্দ্রপুর হয়েছে মোহাম্মদপুর, নরসিংদীর বাবুরহাট হয়েছে শেখেরচর ইত্যাদি।

এ তালিকা বেশ বড়ো, তবে এ.কে আজাদ ও মিঠুন গোস্বামী লিখেছেন, 'ঘুম থেকে উঠে আর রাম নাম নয়, তাইতো রাজবাড়ির 'রামদিয়া' এখন ইসলামপুর। চেয়ারম্যান পূর্ব-বালিথুবা তাঁর ফেইসবুকে লিখেছেন, 'আলহামদুল্লিলাহ, দেবীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এখন ইসলামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় করা হয়েছে'। নাম পরিবর্তনের খেলা বেশ পুরানো। পারলে এঁরা দিনগুলোর নাম সোম, মঙ্গলবার বদলে ইসলামি নাম রাখতো। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র নদ-নদীর নাম পালটে দিতো।

সমস্যা হচ্ছে, হিন্দুরা পুরো বাংলা ভাষাটা দখল করে বসে আছে, ৯০ শতাংশ মুসলমানের দেশে এটি মেনে নেওয়া যায় না! সামাজিক মাধ্যমে একজন লিখেছেন, ভারতেও নাম পরিবর্তন হচ্ছে। উত্তরে আর একজন লিখেছেন, ভারতে পুরানো নাম পুনর্বহাল হচ্ছে, যেমন এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, যা এর পূর্বেকার নাম। বাংলাদেশে হচ্ছে ইসলামীকরণ। একজন নুরুল আমিন লিখেছেন, 'কালো কালিতে লেখা নাম, 'আউলিয়া নগর' কিন্তু পাথরে খোদিত নামটি এখনও অক্ষত, তা হচ্ছে, 'রাম-অমৃতগঞ্জ'। পরের স্টেশনের নাম ছিল 'সেনবাড়ি', হয়েছে আহমেদাবাদ, কালিরবাজার হয়েছে ফাতেমানগর।

বলি কী, পুরনো নাম ভালো, তাই আমাদের প্রধান বিমানবন্দরটি পূর্ব-নামে, অর্থাৎ 'কুর্মিটোলা আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর নামে ফিরে এলে মন্দ কী! □

স্বামীজীর আমেরিকা যাত্রা ও শিকাগো বক্তৃতার পটভূমি

সূর্য শেখর হালদার

স্বামী বিবেকানন্দ জন্মেছিলেন পরাধীন দেশের প্রজা হয়ে। কিন্তু তিনি ভারতীয় সংস্কৃতি, ভারতীয় ঐতিহ্যকে সারা বিশ্বের মধ্যে উচ্চস্থানে তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন ভারতীয়দের আত্মমর্যাদাবোধ তৈরি করতে না পারলে, জগতের সামনে ভারতের হৃত মর্যাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে না পারলে, ভারতকে জগৎসভার শ্রেষ্ঠ আসনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। সে কারণেই সমগ্র ভারত পরিভ্রমণের পর তিনি সচেষ্ট হন আমেরিকা যাত্রা করে ধর্ম মহাসভায় ভারতের সনাতন ধর্মের ধ্বজা উত্তোলন করতে। কয়েকটি ঘটনা স্বামীজীকে আরও বেশি করে অনুপ্রাণিত করেছিল শিকাগো যাত্রার জন্য। তার মধ্যে অন্যতম একটি হলো আবু রোড স্টেশনে এক ইউরোপীয় রেল কর্মচারীর এক ভারতীয় যাত্রীর সঙ্গে দুর্ব্যবহার। গুরু শ্রীরামকৃষ্ণ এবং জগজ্জননীর কাছেও তিনি আমেরিকা যাত্রার জন্য পেয়েছিলেন সুস্পষ্ট নির্দেশ। যখন তাঁর মনে পাশ্চাত্য যাত্রা উচিত হবে কিনা সে নিয়ে দ্বন্দ্ব কাজ করছে, তখন তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ সমুদ্র অতিক্রম করে যাচ্ছেন, আর

তাঁকে ইঙ্গিত করছেন অনুসরণ করতে। সেই রাতে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল স্বামীজীর। আর তিনি শুনতে পেয়েছিলেন গুরুর নির্দেশ— 'যাও, বিশ্বের কাছে প্রতিষ্ঠা কর ভারতকে।' ৩১ মে ১৮৯৩ পেনিনসুলার জাহাজে করে বোম্বে থেকে আমেরিকা যাত্রার ঠিক কয়েকদিন পূর্বে গুরুভাই স্বামী তুরিয়ানন্দকে কথাপ্রসঙ্গে স্বামীজী বললেন, 'হরি ভাই, এই ধর্মসভা-টভা যা হচ্ছে এসব এর (নিজের দিকে তাকিয়ে) জন্য। আমার মন তাই বলছে।'

স্বামীজী শিকাগো যাত্রা করেছিলেন খেতরির মহারাজার উদ্যোগে। তবে মাদ্রাজ থেকে খেতরি যাত্রার আগেই স্বামীজীর জন্য আমেরিকা যাত্রার টিকিট করে ফেলেছিলেন আলাসিঙ্গা প্রমুখ যুবকেরা। তাঁরা নিজেদের অর্থেই দ্বিতীয় শ্রেণীর একটি টিকিট কিনেছিলেন স্বামীজীর জন্য। খেতরির রাজার নির্দেশে জগমোহন লাল দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিটকে প্রথম শ্রেণীর টিকিটে পরিবর্তন করে দেন। তাছাড়া স্বামীজীর আশীর্বাদে পুত্র সন্তান প্রাপ্ত রাজার ইচ্ছা ছিল তাঁর গুরু যেন রাজবেশে পাশ্চাত্যে পদার্পণ করেন। তাই রাজার নির্দেশে স্বামীজীর জন্য এসেছিল একটি সিল্কের আলখাল্লা ও পাগড়ি। তবে এর বদলে গরম পোশাক কিনে দিলে স্বামীজীর বাস্তবে উপকার হতো, আমেরিকার প্রবল ঠাণ্ডার সঙ্গে তিনি যুদ্ধ করতে পারতেন। কিন্তু রাজার বা স্বামীজীর দক্ষিণ ভারতীয় ভক্তদের কারোরই অপরিচিত স্থানের আবহাওয়া কী রকম হতে পারে সে সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তবে বীর সন্ন্যাসীকে দমিয়ে রাখা আমেরিকা কেন অ্যান্টার্কটিকার শীতের পক্ষেও সম্ভব ছিল না। তাই শত প্রতিকূলতা জয় করে পাশ্চাত্য মননে এবং হৃদয়ে ভারতকে প্রতিষ্ঠা করেন এই সিংহহৃদয় গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী।

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৩১ মে পেনিনসুলার জাহাজে স্বামীজী যাত্রা করেন বোম্বে থেকে আমেরিকার পথে। পথে একবার জাহাজ বদলে ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জুলাই এমপ্রেস অব ইন্ডিয়া জাহাজে করে তিনি উপস্থিত হন কানাডার ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে। ভ্যাঙ্কুভার থেকে দীর্ঘ ট্রেন যাত্রা করে, দুবার ট্রেন পালটে শিকাগোতে তিনি উপস্থিত হন ৩০ জুলাই । সেদিন ছিল রবিবার; সময় রাত এগারোটা। পরিবেশ ছিল সম্পূর্ণ অপরিচিত। তাঁর কাছে না ছিল যথেষ্ট অর্থ, না ছিল উপযুক্ত পোশাক। কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছিলেন স্বামীজী। এই সময় তিনি জানতে পারলেন এক মর্মান্তিক সত্য। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় যোগদান করতে গেলে পরিচয়পত্র চাই। কিন্তু তাঁর কাছে তো কোনো পরিচয়পত্র নেই ! ভারত থেকে আনাতে গেলেও তাতে কোনো লাভ হবে না। কারণ ধর্ম মহাসভায় যোগদান করার তারিখ পেরিয়ে গেছে। স্বামীজীর মন ভেঙে চুরমার হয়ে গেল, তবে হতাশ হলেন না তিনি। কারণ তিনি হলেন চিরকালের বীর, প্রতিকূল অবস্থায় তাঁর মন আরও শক্ত হয়ে ওঠে। তিনি ভাবতে লাগলেন আমেরিকায় থেকে কীভাবে ভারতের ভাব তিনি প্রচার করতে পারেন।

এই সময় তিনি শুনলেন শিকাগোর থেকে বস্টন শহরের থাকা-খাওয়ার খরচ অনেক কম। তার পুঁজি অল্প। তাই ট্রেনে করে তিনি যাত্রা করলেন বস্টন অভিমুখে। ট্রেনেই পরিচয় হলো মাঝবয়সি এক অমেরিকান মহিলার সঙ্গে। তাঁর নাম মিস ক্যাথেরিন স্যানবর্ন। স্বামীজীর সৌম্য দীপ্ত চেহারা দেখে আকৃষ্ট হয়েছিলেন তিনি। তাই নিজে এগিয়ে এসে কথা বললেন স্বামীজীর সঙ্গে এবং দুই-একটি কথাতেই মুগ্ধ হলে ঠিক যেমন ভারতবর্ষে সবাই হতো। ভগবানের অদ্ভুত কৃপা। ওই মহিলাও ছিলেন বস্টনবাসী এবং তাঁর খামারবাড়িতে জায়গা হলো স্বামীজীর। এর ফলে দৈনন্দিন রাহা খরচ বেঁচে গেলে স্বামীজীর।

ধর্ম মহাসভায় যোগ দেবার সমস্ত রাস্তা সেই মুহূর্তে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তবুও স্বামীজী আশা করলেন আমেরিকায় থেকে ভারতের জন্য কিছু কাজ তিনি করতে পারবেন। তিনি শিষ্যদের চিঠিতে জানালেন যে যদি তাঁকে মাস দুয়েক আমেরিকায় থাকার খরচ ভারত থেকে পাঠানো যায় তবে তিনি খড়কুটো আঁকড়ে ধরে ভেসে থাকবেন এবং পাশ্চাত্যবাসীর কাছে ভারতকে চেনানোর উদ্যোগ গ্রহণ করবেন। যদি আমেরিকায় তিনি ব্যর্থ হন, তাহলে ইংল্যান্ড গিয়ে চেষ্টা করবেন। আর যদি সেখানেও ব্যর্থ হন তাহলে আবার ফিরে যাবেন ভারতে এবং ঈশ্বরের পরবর্তী নির্দেশের অপেক্ষা করবেন।

যাইহোক, স্বামীজীকে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথ হতে হয়নি। স্যানবর্ণের সূত্রে বস্টনের শিক্ষিত সমাজে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়ে উঠতে লাগলেন স্বামীজী। বিভিন্ন ক্লাবে, গির্জায় সভা করতে লাগলেন। বস্টনের সংবাদপত্রে তাঁর বক্তৃতার খবর বের হতে লাগল। বস্টনের সংবাদপত্রগুলি কখনো তাঁকে 'রাজা', কখনো আবার 'সন্ন্যাসী' বলে সম্বোধন করতে লাগল। সত্যই তিনি ছিলেন সন্ন্যাসী রাজা। তাঁর বক্তব্যে মোহিত হলো বস্টনবাসী। প্রতিটা সংবাদপত্র গুরুত্ব দিয়ে ছাপতে লাগল তাঁর বক্তব্যের সারমর্ম।

এবার স্যানবর্নের সূত্র ধরেই স্বামীজীর সঙ্গে পরিচয় হলো হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের। এই সুপণ্ডিত অধ্যাপক সম্পর্কে বলা হতো যে তিনি ছিলেন বিশ্বকোষ তুল্য জ্ঞানভাণ্ডারের অধিকারী। তিনিও স্বামীজীর প্রতিভায় বিমুগ্ধ হলেন। স্বামীজীর সঙ্গে কথা বলে তিনি জানতে পারলেন যে পরিচয় পত্রের অভাবে স্বামীজী যোগ দিতে পারছেন না শিকাগো ধর্ম মহাসভাতে। এই কথা শুনে রাইট বললেন, 'আপনার কাছে পরিচয় পত্র চাওয়ার অর্থ হলো সূর্যকে প্রশ্ন করা তার কিরণ দেওয়ার অধিকার আছে কিনা।'

এরপর আর পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। অধ্যাপক রাইট নিজেই এক পরিচয় পত্র লিখে দিলেন। তিনি লিখলেন যে স্বামীজী এমন এক ব্যক্তি যে আমেরিকার সমস্ত পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য এক করলেও তাঁর পাণ্ডিত্যের সমান হবে না। শুধু তাই নয় তিনি শিকাগো পর্যন্ত যাওয়ার জন্য স্বামীজীকে টিকিট কিনে দিলেন এবং সঙ্গে কিছু অর্থ রাশিও দিলেন যাতে শিকাগোতে স্বামীজীর কোনো অসুবিধা না হয়। এভাবেই অধ্যাপক রাইটের চেষ্টায় অসম্ভব সম্ভব হলো। স্বামীজীর কাছে দ্বার খুলে গেল শিকাগো ধর্ম মহাসভার। এর পরে যা ঘটেছিল সেটা

ঐতিহাসিক। তাঁর প্রথম বক্তৃতাতেই পাশ্চাত্যবাসীর হৃদয় জয় করে নিয়েছিলেন স্বামীজী। সেই দিনটা ছিল আজ থেকে ঠিক ১২৯ বছর আগের ১১ সেপ্টেম্বর। এরপর ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বেশ কতকগুলি বক্তৃতা করেছিলেন স্বামীজী। তিনি হয়ে উঠেছিলেন শিকাগো ধর্ম মহাসভার মধ্যমণি। আর ভারতের সংস্কৃতি, ধর্ম প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল সারা বিশ্বের দরবারে।

বস্তুত শিকাগোর বিশ্বধর্ম মহাসভা পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। এই ধর্ম মহাসভার আয়োজন হয়েছিল কলম্বাসের আমেরিকা আগমনের চারশো বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে। এই ধর্ম মহাসভা ছিল আসলে এক বিরাট মেলার অংশ। এই মেলায় অনেক রকম প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়েছিল। তবে সকল প্রকার প্রদর্শনী ও অনুষ্ঠানের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ধর্ম মহাসভা। এই মেলার নাম ছিল কলম্বিয়ান এক্সপোজিশন।

এই ধর্ম মহাসভা প্রস্তুতির জন্য সময় লেগেছিল প্রায় ত্রিশ মাস। এর প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন জন হেনরি ব্যারোজ। এই ধর্ম মহাসভার প্রস্তুতির জন্য উদ্যোক্তাদের প্রায় দশ সহস্র চিঠি এবং চল্লিশ সহস্র অন্যান্য নথিপত্র রেলপথে ও স্টিমার যোগে পৃথিবীর বিভিন্ন ঠিকানায় পাঠাতে হয়েছিল। মোট দশটি ধর্মের প্রতিনিধিরা এই ধর্ম মহাসভায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই ধর্মগুলি হলো ইহুদি, ইসলাম, হিন্দু, বৌদ্ধ, তাও, কনফুসিয়াস মতবাদ, শিনটো, পারসিক ধর্ম, ক্যাথলিক এবং গ্রীক চার্চ ও প্রটেস্ট্যান্ট ধর্ম। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট দুটোই খ্রিস্টান রিলিজিয়নের অন্তর্গত। কিন্তু উভয়ের মধ্যে বিরোধের ইতিহাসের কারণেই এই দুই খ্রিস্টান সম্প্রদায়কে আলাদা আলাদাভাবে আহ্বান করা হয়েছিল।

ধর্ম মহাসভার জন্য স্থান নির্বাচিত হয়েছিল শিকাগোর আর্ট ইনস্টিটিউট। ধর্ম মহাসভার অধিবেশনগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত ছিল— মূল শাখা ও বিজ্ঞান শাখা। মূল শাখার অনুষ্ঠানগুলি হয়েছিল কলম্বাস হলে, যেখানে আসন সংখ্যা ছিল চার সহস্র। আর বিজ্ঞান শাখার জন্য নির্ধারিত ছিল ওয়াশিংটন হল।

ধর্ম মহাসভায় উদ্যোক্তারা ধর্ম মহাসভার উদ্দেশ্য হিসেবে বেশ কয়েকটি বিষয় ঘোষণা করেছিলেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল :

প্রধান প্রধান ঐতিহাসিক ধর্মের প্রতিনিধিদের ইতিহাসে প্রথমবারের জন্য একই সভায় একত্রিত করা।

বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে কী কী সাধারণ সত্য রয়েছে সেগুলিকে তুলে ধরা।

প্রতিটি ধর্ম ও খ্রিস্টান চার্চের বিভিন্ন শাখা যে সত্যগুলিকে তাদের ধর্মের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করে সেগুলিকে নির্দিষ্ট করে দেখানো।

বিভিন্ন ধর্ম পরস্পরকে কীভাবে আলোকিত করেছে বা আগামী দিনে আলোকিত করতে পারে সেটি আলোচনা করা।

শিক্ষা দারিদ্র্য প্রভৃতি ব্যবহারিক সমস্যাগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে ধর্ম কোনো আলোকপাত করতে পারে কিনা, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা।

বিভিন্ন দেশ ও জাতিকে অধিকতর সৌহার্দ্য সূত্রে বাঁধা যাতে পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তির পথ সুগম হয়।

এই সকল উদ্দেশ্যই সন্দেহাতীতভাবে অসাধারণ ছিল। কিন্তু তবুও শুনলে আশ্চর্য লাগবে যে এই মহৎ উদ্দেশ্য সমন্বিত ধর্ম মহাসভার বিরোধিতা উদ্যোক্তাদের সহ্য করতে হয়েছিল। এই বিরোধিতা এসেছিল খ্রিস্টধর্মের থেকে। ধর্ম মহাসভা আয়োজনের বিরোধিতা যেসব খ্রিস্টান মতালম্বী মানুষ করেছিলেন, তাঁদের বক্তব্য ছিল খ্রিস্টধর্মই একমাত্র ধর্ম এবং সেটাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম। অতএব অন্য কোনো ধর্মকেই খ্রিস্টান ধর্মের সঙ্গে সম আসনে বসানো যাবে না। ক্যান্টারবেরির আর্চবিশপ (ইংল্যান্ডের অ্যাংলিকান চার্চের প্রধান) এই ধর্ম মহাসভায় অংশগ্রহণ করতে অস্বীকার করেন এবং সকল খ্রিস্টান ধর্মগুরুদের যোগ দেবার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে অনুরোধ জানান। ধর্ম মহাসভার প্রধান উদ্যোক্তা ড. ব্যারোজ অবশ্যই এই মতামতে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু গোপনে তাঁর উদ্দেশ্য ও আশা ছিল সকল ধর্মের উপস্থিতিতে খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠা করা। ধর্ম মহাসভার স্বপক্ষে বলতে গিয়ে তিনি উল্লেখ করেন যে অন্য ধর্মে যেসব সত্য আছে, সেগুলি খ্রিস্ট ধর্মতেও আছে। এছাড়াও খ্রিস্ট ধর্মের মধ্যে আরও অনেক সত্য আছে। তিনি আরও বলেন আলোর সঙ্গে অন্ধকারের বন্ধুত্ব হতে পারে না, কিন্তু আলোর সঙ্গে অল্প আলোর বন্ধুত্ব হতে পারে। সেই সঙ্গে তিনি এই মত প্রকাশ করেন যে ধর্ম মহাসভার পরে খ্রিস্টধর্ম অন্য সব ধর্মের স্থান দখল করে নেবে।

যাইহোক, ধর্ম মহাসভার পর দেখা গেল উদ্যোক্তাদের এই উদ্দেশ্য পূরণ হলো না। এর কারণ যে ব্যক্তি ছিলেন, তিনি হলেন স্বামী বিবেকানন্দ। প্রথম থেকেই উদ্যোক্তাদের এই গর্বিত ভাব স্বামী বিবেকানন্দের দৃষ্টি এড়ায়নি। পরে তিনি একটি চিঠিতে লিখেছিলেন বিশ্ব ধর্মসভার আয়োজন করা হয়েছিল খ্রিস্টধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার উদ্দেশ্যে। সে কারণেই শিকাগোতে ১১ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে তিনি প্রথম যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেই বক্তৃতার শুরুতেই সকল আমেরিকাবাসীকে ভ্রাতা ও ভগিনী বলে সম্বোধন করেন। সেই সঙ্গে ওই বক্তৃতায় তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব তুলে না ধরে সনাতন ধর্মের সহিষ্ণুতার দিকটি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষিত আমেরিকাবাসীর হৃদয়ে প্রবেশ করে জানিয়ে দেওয়া যে তাঁরা যেখানে অন্য ধর্মকে না জেনে নিজের ধর্মকেই গর্বিতভাবে উচ্চে তুলে ধরতে চান সেখানে সনাতন ধর্ম অন্য ধর্মকে সত্য বলে স্বীকার করে। উল্লেখ্য স্বামীজীর এই বিনয়ী ও মার্জিত ভাব আমেরিকার সকল বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় এবং সাধারণ মানুষের হৃদয় স্পর্শ করে। তিনি হয়ে ওঠেন ধর্ম মহাসভার প্রধান আকর্ষণের কেন্দ্র এবং পরবর্তী বক্তৃতাগুলিতে তিনি সনাতন ধর্মের সারসত্য আমেরিকাবাসীর কাছে তুলে ধরেন। যেসব বক্তৃতাতে তিনি সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠ দিকগুলি তুলে ধরেছিলেন সেগুলির মধ্যে

অন্যতম উল্লেখযোগ্য হলো Paper on Hinduism। ১৯ সেপ্টেম্বর ১৮৯৩ তারিখে স্বামীজী তাঁর নিজের লিখিত এই ভাষণ পাঠ করেছিলেন।

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে বস্টনের অধ্যাপক জন হেনরি রাইটের উদ্যোগে শিকাগো ধর্ম মহাসভা বক্তৃতা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরিচয় পত্র পান স্বামীজী। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ৯ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যাবেলায় স্বামীজীর শিকাগোতে এসে পৌঁছান। কিন্তু এবারেও শিকাগো পৌঁছে স্বামীজী আরেক বিপত্তির সম্মুখীন হলেন। তিনি দেখলেন যে ধর্ম মহাসভার অফিসের ঠিকানা লেখা কাগজটা তিনি হারিয়ে ফেলেছেন। কাউকে জিজ্ঞাসা করেও অফিসের কোনো সন্ধান পেলেন না। তখন ক্লান্ত অবসন্ন সন্ন্যাসী শিকাগো স্টেশনের একটি মালগাড়ির ফাঁকা কামরায় আশ্রয় নিলেন। প্রবল শীত এবং ক্ষুধা সহ্য করে তিনি মালগাড়ির মধ্যে রাত কাটালেন। সকালে তিনি চেষ্টা করলেন ভিক্ষা করে কিছু আহার্য সংগ্রহের। কিন্তু আমেরিকা আর ভারত এক নয়। আমেরিকায় ভিক্ষাজীবী সন্ন্যাসীকে কেউ ভিক্ষা দেয় না। অতঃপর কেউ মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দিল, কেউ-বা বন্দুক দেখিয়ে তাড়ানোর চেষ্টা করল। কিছুক্ষণ চেষ্টার পর স্বামীজী রাস্তার ধারে অবসন্ন অবস্থায় বসে পড়লেন এবং সিদ্ধান্ত করলেন ঈশ্বরের নির্দেশে যখন তিনি দেশ ছেড়ে এখানে এসেছেন তখন ঈশ্বরই তাঁকে রক্ষা করবেন।

যে কোনো মহৎ কাজ মানুষের নিরন্তর চেষ্টা ছাড়া সম্ভব নয়। কিন্তু দৈবিক আশীর্বাদ ছাড়া কোনো মহৎ কাজই আবার সফল হয় না। শ্রীরাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন, কিন্তু তবুও রাবণ বধের জন্য তাঁকে দৈবিক সাহায্য লাভ করতে হয়েছিল। শ্রী হনুমান, জাম্বুবান, মহারাজ সুগ্রীব ও বিভীষণের সাহায্য রাবণের সঙ্গে অন্তিম যুদ্ধের পূর্বে মাতলী চালিত ইন্দ্রের রথ না থাকলে শ্রীরামের পক্ষে রাবণ বধ সম্ভব হতো কী? রামায়ণ পাঠ করলে আমরা দেখব এই সবই ছিল দৈবিক সাহায্য। স্বামীজীও ঠিক সেইরকম প্রয়োজনীয় মুহূর্তে দৈবিক সাহায্য লাভ করলেন। এই ক্ষেত্রে দৈবিক অনুকম্পা রূপে আবির্ভূত হলেন মিসেস জর্জ ডব্লিউ হেল। যে রাস্তায় স্বামীজী বসে ছিলেন ঠিক তার উলটো দিকের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। রাজরানি সদৃশ এই ভদ্রমহিলা স্বামীজীকে দেখে জানতে চাইলেন যে তিনি ধর্ম মহাসভায় যোগ দিতে এসেছেন কিনা। স্বামীজী সদর্থক উত্তর দিতেই ভদ্রমহিলা সসম্মানে স্বামীজীকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা করলেন। ধর্ম মহাসভার আধিকারিকদের সঙ্গে মিসেস হেলের যোগাযোগ ছিল। তাই বিকেলেই স্বামীজীকে নিয়ে তিনি গেলেন ধর্ম মহাসভার অফিসে। সেখানে রাইট সাহেবের দেওয়া পরিচয়পত্র দেখাতেই স্বামীজী ধর্ম মহাসভায় প্রতিনিধি হিসেবে গৃহীত হলেন। এভাবেই দেখা যায় শিকাগোতে বক্তৃতা দিয়ে বিশ্ব জয় করার পথে একাধিকবার দৈবিক সাহায্য পেয়েছিলেন স্বামীজী। তাঁর শিকাগো যাত্রাও ছিল ঈশ্বরের নির্দেশ। তাঁর সৎ প্রচেষ্টা তো ছিলই, কিন্তু যখনই অজানা অচেনা পরিবেশে একাকী সন্ন্যাসী কোনো বিপদে পড়েছেন, তখনই তিনি অলৌকিভাবে পরিত্রাণ পেয়েছেন। আর সাহায্য করেছেন কিছু আমেরিকাবাসীই। সম্পূর্ণ অপরিচিত মানুষদের থেকে হঠাৎ পাওয়া এই সাহায্যকে দৈবিক সাহায্য ছাড়া আর কী বলা যেতে পারে?

ধর্ম মহাসভায় প্রতিনিধি হবার পর উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে স্বামীজীকে মিস্টার লায়নের বাড়িতে থাকতে দেওয়া হলো। মিস্টার লায়ন দেখলেন ধর্ম মহাসভা যে প্রতিনিধিকে তাঁর বাড়িতে থাকতে দেওয়া হয়েছে, তিনি শ্বেতাঙ্গ নন। তখন তিনি ভাবলেন যে স্বামীজীকে বাড়িতে না রেখে হোটেলে রাখবেন। কারণ সেই সময় তাঁর বাড়িতে কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ অতিথি ছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা এবং তাঁর সঙ্গে দু'একটি কথা বলে মিস্টার লায়ন এতটাই মুগ্ধ হলেন যে তিনি তাঁর স্ত্রীকে বললেন তাদের অন্য অতিথিরা স্বামীজীর আগমনে বিরক্ত হলেও তিনি স্বামীজীকে বাড়িতেই রাখবেন। স্বামীজীর মতো এত আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং প্রতিভাধর মানুষ আগে কোনোদিন তাঁদের বাড়িতে আসেননি। তাই স্বামীজীর যতদিন ইচ্ছা হয় তিনি মিস্টার লায়নের বাড়িতে থাকবেন।

এভাবেই ধর্ম মহাসভায় বক্তৃতা রাখার প্রস্তুতিপর্ব সম্পন্ন হলো স্বামীজীর। ধর্ম মহাসভা শুরুর দিন ছিল ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে ১১ সেপ্টেম্বর। সেদিন যা ঘটেছিল, সেটা ঐতিহাসিক। তবে তার আগে যেসব বাধা স্বামীজী জয় করে এগিয়ে গিয়েছিলেন সেগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্বও কম নয়। ইংরেজিতে একটা কথা আছে : 'God help those who help themselves'। বিশ্বের সমক্ষে দেশকে তুলে ধরার স্বামীজীর যে আন্তরিক ও নিরলস প্রচেষ্টা, সেটা ঈশ্বরও প্রত্যক্ষ করেছিলেন। তাই দৈব আশীর্বাদ ছিল স্বামীজীর সহায়। ১১ সেপ্টেম্বর সেই ঐতিহাসিক ক্ষণে দেবী সরস্বতীকে স্মরণ করে যে বক্তৃতা স্বামীজী করেছিলেন, তাতেই চমকিত হয়েছিল সারা বিশ্ব। এ যেন বিখ্যাত ইংরেজ নাট্যকার উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের নাটকে মার্ক অ্যান্টনির বক্তব্য (Antony's Oracle)। জুলিয়াস সীজারকে হত্যা করার পর জুলিয়াস সীজারের অন্তিম যাত্রায় স্বল্প কিছু বলার অনুমোদন লাভ করেছিলেন সীজারের বিশ্বস্ত সেনাপতি মার্ক অ্যান্টনি। চতুর্দিকে শত্রু ঘেরা, পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে সীজার অনুগত অ্যান্টনি যা বলেছিলেন তাতে সারা রোম কেঁপে গিয়েছিল। এতক্ষণ সীজারকে শত্রুভাবা রোমবাসী অ্যান্টনির বক্তব্য শুনে পরিণত হয়েছিল সীজারের সমব্যথীতে এবং সমর্থন জানিয়েছিল সীজার অনুগত অ্যান্টনিকে : সীজার হত্যাকারী ক্যাসিয়াস বা ব্রুটাসকে নয়। স্বামীজীর শিকাগো ধর্ম মহাসভা থেকে উদ্বোধনী ভাষণও ঠিক এইরকমই ছিল। বিদেশের মাটিতে, সম্পূরণ অহিন্দু পরিবেশের মধ্যে দাঁড়িয়ে স্বামীজী যা বলেছিলেন তাতে আমেরিকার ক্রিশ্চান শ্রোতারই ধন্য ধন্য করেছিলেন স্বামীজীর আর আমাদের সনাতন ধর্মের।

তথ্যসূত্র : *পরিব্রাজক স্বামীজী : দেশে ও বিদেশে। রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা।*

পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই মহিলা হজ যাত্রীর সংখ্যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ এ বছর হজযাত্রাকে আরও স্বচ্ছন্দ, আরামদায়ক এবং সুলভ করে তুলতে কয়েকটি বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। হজ যাত্রীদের সঠিকভাবে নির্বাচনের জন্য সমগ্র প্রক্রিয়াটিকে স্বচ্ছ, দক্ষ এবং নিরপেক্ষ করে তোলার ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। হজ যাত্রীদের বেছে নেওয়ার উদ্দেশ্যে সমগ্র প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা হয় অনলাইন ব্যবস্থায়। এবার হজযাত্রার বিষয়টিতে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এঁদের মধ্যে সত্তরোর্ধ যাত্রীর সংখ্যা ১০,৬২১ জন। অন্যদিকে, কোনও পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই হজযাত্রার অনুমতি দেওয়া হয়েছে ৪,৩১৪ জন মহিলাকে। কোনও পুরুষ সঙ্গী ছাড়া হজযাত্রার ক্ষেত্রে মহিলাদের এই সংখ্যা এযাবৎকালের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে জানা গেছে।

হজযাত্রার জন্য যে আবেদনগুলি জমা পড়ে তা অনলাইন র‍্যান্ডোমাইজড ডিজিটাল সিলেকশন (ওআরডিএস) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। এ ব্যাপারে কোনওরকম হস্তক্ষেপকে আমল দেওয়া হয়নি। নির্বাচিত এবং অপেক্ষমান আবেদনকারীদের একটি তালিকাও সরকারি পোর্টালে তুলে ধরা হয়েছে। নির্বাচিত যাত্রীদের মোবাইলে এসএমএস-এর মাধ্যমে তাঁদের হজযাত্রার অনুমতিদানের বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। একইভাবে এসএমএস পাঠানো হয়েছে অপেক্ষমান যাত্রীদের কাছেও।

হজ যাত্রীদের বিদেশি মুদ্রা বিনিময় সংক্রান্ত ব্যাপারে স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া (এসবিআই)-এর সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থাক্রমে যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সংখ্যালঘু বিষয়ক মন্ত্রক। যাত্রীরা গন্তব্যে পৌঁছনোর পর এসবিআই-এর স্টলগুলিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম তাঁদের প্রয়োজনীয় কাজ সেরে ফেলতে পারবেন।

রিষড়ায় বিয়ের অনুষ্ঠানে গাছ বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সমগ্র রাজ্যবাসী যখন গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহে অতিষ্ট, সমাজ মাধ্যম থেকে শুরু করে সমস্ত জায়গায় যখন মানুষ জোর দিচ্ছে গাছ লাগানোর উপর, ঠিক সেই সময় দাঁড়িয়ে হরিপাল নিবাসী গৌতম চক্রবর্তী ও সৃঞ্জনা চক্রবর্তী তাদের একমাত্র কন্যা তিস্তার শুভবিবাহকে উপলক্ষ্য করে গাছ বিতরণের সিদ্ধান্ত নেন। রিষড়ার একটি লজে সম্পন্ন হওয়া এই বিবাহ আনুষ্ঠানে নিমন্ত্রিত ছিলেন প্রায় ৮০০ জনেরও বেশি অতিথি। উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে পাঁচশ গাছ বিতরণ করা হয়।

তিস্তার মা সৃঞ্জনা দেবীর কথায়, 'আমাদের মেয়ের বিবাহ অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করে আজকের এই বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে কিছুটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করতে পেরে খুব ভালো লাগছে। আমাদের বন্ধু জাঙ্গিপাড়ার রাজা চক্রবর্তী তার ছেলে দিগন্তর উপনয়নকে কেন্দ্র করে এরকম সামাজিক কার্যক্রম করেছিল। তা দেখে আমিও সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম এই কাজ করার। আজকে সমাজের সমস্ত মানুষ যদি আনন্দ অনুষ্ঠানকে সামাজিক অনুষ্ঠানের রূপ দেয় তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের সমাজ সুন্দর হয়ে উঠবে।'

তাঁদের এই গাছ বিতরণের কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিদের মধ্যে তিস্তার স্কুলের শিক্ষিকা রত্না মজুমদার চক্রবর্তী বলেন, 'বর্তমানে পরিবেশের যা অবস্থা, চারিদিকে শুধু গাছ কাটা হচ্ছে। সেই সময়ে দাঁড়িয়ে বিবাহ অনুষ্ঠানে এই অভিনব উদ্যোগকে সাধুবাদ জানাই। এই কর্মসূচি আয়োজনের জন্য তিস্তাকে এবং তিস্তার বাবা-মাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ এবং সঙ্গে সঙ্গে আশা রাখি এই সামাজিক কর্মসুচির মধ্য দিয়ে এক বার্তা মানুষের মধ্যে পৌঁছবে।'

।। চিত্রকথা।। মহামানব মহানামব্রত।। ৪৩।।

কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনের ছাত্র ছিলেন টমাস মারটন। মহানামব্রতজীর সহপাঠী। পরে তিনি হয়ে গেলেন লুইবাবা। ফাদার লুই।

লুইবাবা স্বীকার করেন মহানামব্রতই তাঁর গুরু, পথ প্রদর্শক। তাঁর মধ্যেই লুই দেখতে পেয়েছিলেন এক পরিপূর্ণ মানুষকে। ভগবানের প্রতি বিশ্বাসই যাঁর জীবনের মন্ত্র। তিনিই তাঁকে এই আশ্রমজীবনের পথ দেখিয়েছেন। ১৯৩৪ সালে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবার পর ১৯৪১ থেকে তিনি সেবামূলক কাজ করে চলেছিলেন।

(ক্রমশ)